ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ।। ২৬ মাঘ, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

এক-হাজারি পানশালার পশ্চিমবঙ্গে পাব-কালচার নিয়ে চুপ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পাব-সংস্কৃতি নিয়ে দেশের চারটি বড় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন সরব হয়েছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখিয়ারা নীরব। কারণ সহজবোধ্য। গত চার বছরে রাজ্যের বিভিন্ন শহরে এরকম পাব বা পানশালার সংখ্যা হয়েছে প্রায় এক হাজার। বছর চারেক আগেও এরাজ্যে বামপন্থীরা পানশালা খোলার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ রাখত। কিন্তু ইদানীং সেসবের বালাই নেই। বছরে গড়ে ২০০-২৫০ নতুন পাব খোলার জন্য লাইসেন্স দিতে শুরু করেছে সিপিএম সরকার। তার জেরে রাজ্যে এখন বার, রেঁস্তোরা এবং বিয়ার পাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় এক হাজার। এছাড়া সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বড় শপিং মলেও বিয়ার এবং ওয়াইন পানের সুবন্দোবস্ত করা হবে। পাব সংস্কৃতি নিয়ে একসময় সিপিএম লড়াই, আন্দোলন করত। এখন অবশ্য সিপিএম নেতারাই পাবের লাইসেন্স প্রাপকদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য। ম্যাঙ্গালোরের একটি পানশালায় বিকাল চারটের সময় প্রায় জনা চল্লিশ অল্প বয়সের ছেলে-মেয়ে অল্প জামা-কাপড় পরে নেশা করছিল। শ্রীরাম সেনা সেখানে গিয়ে ভাঙচুর চালায়। ওই ছেলেমেয়েদের সেখান থেকে বের করে দেয়। দেশজুড়ে তা নিয়ে হইহই শুরু হয়। কেন শ্রীরাম সেনা নীতি পুলিশের কাজ করছে? এই প্রশ্ন যারা তুলেছেন তাঁদের যুক্তি, ছেলে-মেয়েরা নিজেদের খরচে যদি 'এনজয়' করে তাহলে কার কি বলার আছে? খুব ভালো প্রশ্ন, এরপর এই সব ছেলে-মেয়েরা পাবের সংস্কৃতিকে যখন রাস্তায় নামিয়ে আনবে তখনও তাহলে তা মেনে নিতে হবে। তারা স্রেফ নিজেদের খরচে এসব করছে বলে। জানা গিয়েছে, ওই পাবের কোনও লাইসেন্স ছিল না। তাহলে ওই পাব আর আমার, আপনার বাড়ি একই। এরপর পাশের বাড়িতে ছেলে-মেয়েরা এসে এনজয় শুরু করলেও কারও কিছু বলার থাকবে না। শ্রীরাম সেনার কর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আদালত জামিন দিয়েছে। রাজস্থান, দিল্লী, মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীরা পাব সংস্কৃতি নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে টুঁ শব্দটি নেই কেন?

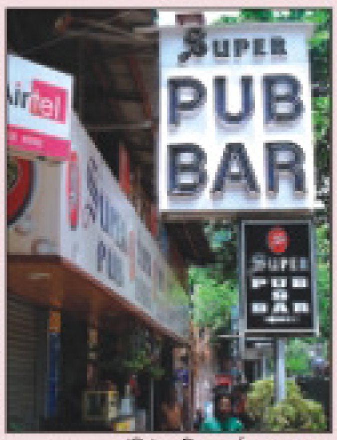

কলকাতার সদর স্ট্রীটে গজিয়ে ওঠা পাব-বার।

মমতার 'একলা চলো' নীতি ব্যুমেরাং হতে পারে

গূঢ়পুরুষ ।। আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের মোকাবিলায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের সার্বিক জোট যে হচ্ছে না তা বুঝতে অসুবিধা নেই। অথচ রাজ্যবাসী আশা করেছিল বামপন্থীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে এবার বিরোধীরা একজোটে ঝাঁপাবে। কিন্তু তা হয়নি। এর কারণ একমাত্র বিজেপি ছাড়া রাজ্যের দ্বিতীয় কোনও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল তার নিজস্ব দলীয় স্বার্থের উপরে উঠে নির্বাচনে বাম বিরোধিতায় রাজি নয়। হ্যাঁ, রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসও নয়। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভায় বিরোধী জোটের কথা বলে আসর গরম করেন। কিন্তু বাস্তবে মমতা চান, তাঁর কাছে মুচলেকা দিয়ে আত্মসমর্পণ করলে, তবেই তিনি দয়া করে তৃণমূলের জোটে বিরোধী দলকে সামিল করবেন। কোনও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন রাজনৈতিক দল কোনও ব্যক্তি বিশেষের কাছে এমন দাসখত লিখে দিতে পারে না। তাই তৃণমূলের তথাকথিত ১৭ পার্টির জোটে যেসব রাজনৈতিক দল আছে তাদের সবই সাইনবোর্ড সর্বস্ব পার্টি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেইসব ভুঁইফোড় দলের নামও শোনেনি। মমতার কাছে দাসখত লিখে দেওয়ার সুবাদে তাদের লোকসভা আসনে তৃণমূল নেত্রী প্রার্থী করবেন। বলা বাহুল্য যে মমতার সৌজন্যে প্রাপ্ত এইসব আসনে বাম প্রার্থীরা অতি সহজেই জয়ী হবে। মমতার সৌজন্যেই এবার সি পি এম নির্বাচনে বিশেষ সুবিধা পেতে চলেছে।

তবে সি পি এম প্রতিদানে কোনও সৌজন্য দেখাবে না। এই দলটির রাজনীতিতে বিরোধীদের প্রতি ভালবাসা দেখানোর কোনও স্থান নেই। বরং বিরোধী অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে সি পি এম চেষ্টা করবে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে মমতাকে হারাতে। রাজ্যে লোকসভা আসনের ডিমিলিটেসনের কল্যাণে সেই সুযোগ সি পি এম পেয়েছে। দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা আসনের সঙ্গে এবার সি পি এম প্রভাবিত বিধানসভা কেন্দ্র কবিতীর্থ, পূর্ব ও পশ্চিম বেহালা, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ এবং কসবাসহ গার্ডেনরিচ ও জোকার একটা বড় এলাকা যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে রাসবিহারী,

(এরপর ৪ পাতায়)

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় জনসংখ্যার ভারসাম্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে এবং তা এতটাই যে এই জেলা অচিরেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় পরিণত হবে। জেলার কোনও কোনও ব্লকে যেমন, ভাঙর (১-২) এবং মগরাহাটে (১-২) মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬৬.৭৭ এবং ৫১.০৯ শতাংশে। এছাড়া মুসলিম জনসংখ্যার শতাংশের হিসাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে যেমন ক্যানিং (১-২) ৪৭, ১৬, বাসন্তী ৪১.১৮ জয়নগর (১-২) ৪৫.৬০, ডায়মণ্ডহারবার (১-২) ৪২.০১, বারুইপুর ৩৫.৪৩, বিষ্ণুপুর (১-২) ৩২.১৬, বজবজ (১-২) ৩৪.৯২, মন্দিরবাজার (১-২) ৩৩.৯১, কুলপি

(এরপর ৪ পাতায়)

ব্লক ভিত্তিক ধর্মীয় জনসংখ্যার শতকরা হিসাব
দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা

ব্লক	ধর্ম	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
ভাঙর	হিন্দু	৪২.২৪	৩৫.০৫	৩৩.১৩
(১-২)	মুসলিম	৫৭.৭৬	৬৪.৯৪	৬৬.৭৭
মগরাহাট	হিন্দু	৮৭.৬৩	৫১.২০	৪৭.৫০
(১-২)	মুসলিম	১০.৮৫	৪৭.৩১	৫১.০৯
ক্যানিং	হিন্দু	৬০.৪৬	৫৫.৬৩	৫২.৫০
(১-২)	মুসলিম	৩৯.২৪	৪৩.৯৬	৪৭.১৬
বাসন্তী	হিন্দু	৬৩.৪২	৫৯.১৬	৫৬.২৩
	মুসলিম	৩৩.০৭	৩৭.৯৫	৪১.১৮
জয়নগর	হিন্দু	৫৮.৫৮	৫৫.৭৮	৫৪.০১
(১-২)	মুসলিম	৪১.৪০	৪৪.০৭	৪৫.৬০

(সূত্র ঃ সেন্সাস রিপোর্ট অফ ইন্ডিয়া ঃ ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাঠে গো-মাংস

ডায়মণ্ডহারবারে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা

সংবাদদাতা ।। গত ২৬ জানুয়ারির সকালে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলো ডায়মণ্ড হারবারের মানুষ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পরিচালিত প্রণব বিদ্যাপীঠ-এর সংলগ্ন মাঠে দুষ্কৃতীরা গরুর মাংস, হাড়, খুর ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে যায়। সকালে যারা ওই মাঠে প্রাতঃভ্রমণের জন্য আসেন তারাই এটা প্রথম দেখে। ওই মাঠে আর এস এসের স্থানীয় শাখাও সকালে হয়। সেদিন প্রজাতন্ত্র দিবস থাকায় স্কুলের ছাত্ররাও প্রজাতন্ত্র দিবস উৎসব পালনের জন্য ওই মাঠে সমবেত হয়েছিল।

এই দৃশ্য দেখে হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। উত্তেজিত হিন্দুরা স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বামী অমলানন্দ এবং স্কুলের সেক্রেটারিকে একথা জানান। আশ্রম কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকে জানালে, তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং উত্তেজনা ছড়ানোর আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্বামী অমলানন্দ ও স্বামী উপানন্দ কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং মাঠটি দ্রুত পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়। মাঠ পরিষ্কার না থাকার কারণে, এদিন এখানে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানও হতে পারেনি।

সন্দেহভাজন দুষ্কৃতীদের বিষয়ে পুলিশ আশ্রম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরেই কিছু মুসলিম দুষ্কৃতী হিন্দু মেয়েদের অপমান, হিন্দু অনুষ্ঠানাদিতে বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করে চলেছে। গতবছর ৫ জুলাই 'মিনিপাকিস্তান' বলে পরিচিত দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাটের জনৈক ব্যক্তি স্বামী অমলানন্দকে হুমকি দেয়, তিনি যেন কোনও হিন্দু সংগঠনকে আশ্রম পরিসর ব্যবহারের অনুমতি না দেন। একই ধরনের হুমকি গত বছর দুর্গাপূজার সময় মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা আশ্রমের প্রদীপ্তানন্দকেও দেওয়া হয়েছিল।

গত কিছুদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এইভাবে পায়ে পা মাড়িয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তসলিমাকে নিয়ে খোদ কলকাতার পার্কস্ট্রীট, হাওড়ার পাঁচলা, দক্ষিণ ২৪পরগণার কুলতলি, উত্তরবঙ্গের করণদিঘী, মালদহের কাঞ্চনতার এবং সম্প্রতি মেদিনীপুরের ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

ভিতরের পাতায়

হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ............৩
বিমানবাবুর পার্টির পচনের স্বীকারোক্তি............৫
বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন কমবে কী?............৬
বিষাক্ত কালনাগ............৮

এই সময়

নিম্নমুখী উন্নয়ণ

পশ্চি মবঙ্গ এগিয়ে চলেছে। তবে নীচের দিকে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য সবদিকেই এই একই অবস্থা। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকারের প্রকাশিত ২০০৭-০৮ 'এডুকেশনাল ডেভলপমেন্ট ইনডেক্স'-এ পশ্চি মবঙ্গের স্থান নীচের দিক থেকে তিন নম্বরে। ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চ লের মধ্যে শিক্ষার গুণগত মানের পরিপ্রেক্ষিতে এরাজ্যের স্থান ৩৩ নম্বরে। ৩২ বছর বাম শাসনাধীন পশ্চি মবঙ্গের স্থান ঝাড়খণ্ডেরও নীচে। তালিকার শীর্ষে রয়েছে পণ্ডিচেরি। উন্নয়ণ হচ্ছে বলে বামফ্রন্ট সরকার গলা ফাটালেও, তা যে ফাঁকা কলসির আওয়াজ তা রিপোর্টেই পরিস্কার।

পুলিশ !

পুলিশের ঘুষ নেওয়ার স্বভাব এবার সমীক্ষাতেও প্রমাণিত হল। ট্রেস ইন্টারনেশন নামে এক এনজিও সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে, এদেশের পুলিশই সব থেকে বেশি ঘুষ নেয়। সারা দেশের পুলিশি ব্যবস্থার এই একই চিত্র। সামান্যতম কাজের বিনিময়েও পুলিশ ঘুষ নেয় বলে সমীক্ষায় স্পষ্ট ধরা পড়েছে। সাধারণ মানুষের সেবার নামে পুলিশের এই চিত্র সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে লজ্জাজনক ইঙ্গিত বলেই অনেকে মনে করছেন।

তোষণ

লোকসভা নির্বাচনের মুখে আবার সংখ্যালঘু তোষণে নামল বামফ্রন্ট। গত ২৬ জানুয়ারি বারুইপুরের এক অনুষ্ঠানে এমনই ইঙ্গিত দিলেন ভূমি সংস্কারমন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লা। তিনি বলেন, এরাজ্যে মুসলিমদের কর্মসংস্থানে সংকট রয়েছে। এজন্য যাতে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, সে বিষয়ে সরকার আরও চেষ্টা চালাবে বলে তিনি জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি মুসলিম ছেলেমেয়েদের কমপিউটারে পরাদর্শী হবার পরামর্শ দেন। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে মন্ত্রীর এই মন্তব্যে অনেকেই মুসলিম ভোটের গন্ধ পাচ্ছেন।

হেরিটেজ কমিশন

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা জাতীয় গর্বের বিষয়বস্তু এবং পরম্পরাগত সৌধগুলিকে উপযুক্ত মর্যাদায় সংরক্ষণের উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। সরকারি সূত্র অনুসারে খুব শীঘ্রই রাজ্যভিত্তিক সমস্ত বিষয়ে একজন করে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরি করা হবে 'ন্যাশনাল কমিশন ফর হেরিটেজ'। এজন্য আর্থিক বরাদ্দের দিকটিও ইতিমধ্যে ঠিক হয়ে গেছে। দেশের বিভিন্ন অংশে কাজও শুরু হয়ে যাবে বলে মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে সম্প্রতি জানানো হয়।

ইউপিএ-এর ব্যর্থতা

দেশের পরিকাঠামো উন্নয়ণে কেন্দ্রের প্রাক্তন এন ডি এ সরকারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে বর্তমান ইউ পি এ সরকার চরম ব্যর্থ বলে উল্লেখ করলেন কর্মরত ইঞ্জিনীয়াররা। সংবাদসূত্র অনুযায়ী, স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের সড়ক উন্নয়ণে এন ডি এ সরকারের 'স্বর্ণ চতুর্ভূজ' যোজনা এবং 'প্রধানমন্ত্রী সড়ক উন্নয়ণ' যোজনাতে ব্যাপকহারে উন্নয়ণ হয়েছিল। কিন্তু ইউ পি এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর, গত পাঁচ বছরে সেই উন্নয়ণের ধারা অনেক কমিয়ে এনেছে। মেরে কেটে প্রায় ৭ হাজার কিলোমিটার নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ণের ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতা দুশ্চি ন্তাজনক বলে বিশেষজ্ঞরা মত ব্যক্ত করেন।

মান উন্নয়ণ

উন্নয়ণের ধারাকে এক নতুন মাত্র দিতে চান কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি এস ইয়েদুরাপ্পা। একটি ইংরেজি সাপ্তাহিককে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি বলেন, পরিকাঠামোগত উন্নয়ণ, কৃষি উন্নয়ণ, শিল্পোন্নয়ণ ইত্যাদি যাই হোক না কেন, তা যদি মানুষের জীবন-যাত্রা তথা ভাবনাচিন্তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি না করতে পারে, তাহলে সবই ব্যর্থ। তাই কর্ণাটকের সমস্ত ধরনের উন্নয়ণের পরিকল্পনা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ণের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

এক লাখ টাকা পুঁজির জেনেক্স সোয়ান-এর হাত ধরে তিনশো আশি কোটি টাকার মালিক !

অয়ন প্রামাণিক ।। চেন্নাই-এর সংস্থা 'জেনেক্স এক্সিম ভেনচারস্ প্রাইভেট লিমিটেড' 'সোয়ান'-এর মতো একটা বড় তামিলনাডু নির্ভর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার হাটে হাঁড়ি ভাঙল। জেনেক্স চার মাস আগে পথ চলা শুরু করে এক লক্ষ টাকা পুঁজি হাতে নিয়ে। অবিশ্বাস্যভাবে ২০০৮-এর ঠিক ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তাদের মালিকানায় চলে আসে সোয়ান টেলিকমের, খুব কম পক্ষেও, প্রায় ৩৮০ কোটি টাকার শেয়ার। চেন্নাইয়ের কোম্পানী রেজিস্টারের নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে, জেনেক্স গত বছর সেপ্টে ম্বরের ১৭ তারিখে মহম্মদ হাসান ও আহমেদ সাকির এই দু'জনকে উচ্চ পর্যায়ে পরিচালনার কাজে নিযুক্ত করেছে। সোয়ানের দপ্তরে এই কোম্পানীকে উপস্থাপিত করে আহমেদ সঈদ সালাউদ্দিন। এই তিন মাথা আসলে তামিলনাড়ুর রামনাথপুরমের কিলুকরাই-এর বাসিন্দা। টেলিকম বাণিজ্যে এরকম কোটি টাকার কেলেঙ্কারী খাস টেলিকম মন্ত্রী এ রাজার মুলুকে ঘটে গেলেও, রাজা'র দাবি তার রাজ্য বা মন্ত্রী হিসেবে তিনি কোনওভাবেই এসবের সঙ্গে জড়িত নয়, এমনকী তিনি এই সমস্ত কোম্পানীগুলিকে জানেনেই না!

যখন সবার চোখের সামনে চলে এসেছে টু জি স্পেকট্রাম (ভারত সরকারের বাণিজ্যিক সুবিধা বন্টনের একটি নিয়ম) বিতর্ক, সাথে সাথে ইউনিটেক ও সোয়ান-এর বিরুদ্ধে এসেছে অবৈধভাবে বৈধতা জোগাড় করে নেওয়ার অভিযোগ, ঠিক তখনই আক্রমাণাত্মক এ রাজার বক্তব্য, 'এই সমস্ত কোম্পানীগুলো উত্তর ও পশ্চি ম ভারতের। তবু কেন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে আমি ওদের সুবিধা পাইয়ে দিয়েছি? এমনকী তামিলনাড়ুর সঙ্গেও এদের কোনও যোগসূত্র নেই।'পরিসংখ্যানের হিসাব বলছে, সোয়ান এমন একটি সংস্থা যাকে খুব সহজেই 'টু জি' লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হয় এবং অফুরন্ত সুবিধা দিয়ে সাত বছর আগের মূল্যে লাইসেন্স ফি নিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়। চেন্নাই সরকারের অনুমতিতেই অবশ্য ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাচক্রে এই বিতর্কের প্রভাব গিয়ে পড়ে সোজা 'থ্রি জি স্পেকট্রাম' প্রথায়। টেলিকম মন্ত্রী খুব শিগ্‌গির এই প্রথায় কাজ শুরু করতে চাইলেও, কেন্দ্র এই ধরনের কোনও পদক্ষেপ এখনই নিচ্ছে না।

এই ঘটনায় তামিলনাডুর যোগসূত্র আরও জোরাল হল যখন জানা গেল আহমেদ সঈদ সালাউদ্দিন নাকি সায়েদ মহম্মদ সালাউদ্দিনের ছোট ছেলে। মহম্মদ সালাউদ্দিন একজন বড় এন আর আই ব্যবসায়ী, যার আসল কারবার দুবাইয়ের রিয়েল এস্টেট বা নির্মাণ সংস্থা। তাঁর 'ই টি এ অ্যাসকন স্টার গ্রুপ' ভারতে কাজ শুরু করে ২০০৬-এ। প্রথমদিকে এই গ্রুপ কাজ শুরু করে তামিলনাডু জুড়ে, যখন সে রাজ্যের দায়িত্বে ছিল রাজা'র দল ডি এম কে এবং রাজা ছিল কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী। ২০০৭-এর মে-তে যখন এ রাজা টেলিকম মন্ত্রী হন, ই টি এ তামিলনাডু সরকারের ৩,৭৫০ কোটির একটি মৌ (বোঝাপড়ার চুক্তি)-তে সই করেছিলেন। মূলত এই টাকা তামিলনাডুতে তথ্য প্রযুক্তির সেজ (বিশেষ অর্থনীতি উন্নয়ণশীল এলাকা) খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এই প্রকল্প কাঞ্চি পুরম (চেন্নাই)-এর ৫০০ একর জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। উদ্ধৃত মৌ চুক্তি বেশ ঘটা করে মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধির উপস্থিতিতেই স্বাক্ষর করা হয়। রহস্য আরও জট পাকালো এই ঘটনায় যে, সোয়ানএর মতো এত বড় আকারের সংস্থা তার বোর্ডে মাত্র লাখ টাকার পুঁজির একটি শিশু কোম্পানীকে অনায়াসে জায়গা দিল কেন। অন্যদিকে জেনেক্স সোয়ানের ১০ শতাংশ শেয়ার হাতে পাওয়ার পরও সোয়ানকে কোনও তথ্যই দেখায়নি যা থেকে বোঝা যায় তার মূল আয়ের উৎস কোথায়। জিজ্ঞেস করা হলে সেই কোম্পানীর প্রতিনিধিরা অবশ্য কিছুই বলেনি।

ই টি এ-র সঙ্গে মৌ চুক্তি স্বাক্ষররত করুণানিধি।

এর আগে রাজা'র আত্মীয়দের কোম্পানী 'গ্রীণ হাউস প্রোমোটারস প্রাইভেট লিমিটেড'-এ বিনিয়োগ করার কথা ভাবছিল সোয়ান। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় সেই কোম্পানীর লুকোচুরি সামনে এসে যাওয়াতে তারা পিছিয়ে আসে। মুম্বাই-এর কোম্পানী রেজিস্টার-কে দেওয়া বিনিয়োগের তালিকায় সোয়ান জানায় — জেনেক্সকে দেওয়া হয় প্রায় ১,৩৩,১৭,২৪৫টি — সামান্য ১০ টাকা মূল্যের শেয়ারগুলোর প্রত্যেকটিকে ২৭৬ টাকার প্রিমিয়ামে। 'এটিসালাট' ইরাক-ইরাণের একটি অন্যতম টেলিকম সংস্থা যার কাছে সোয়ানের শেয়ার আছে। এই সংস্থা মোট ৩,০০০ কোটিরও বেশি মূল্যের শেয়ার পায় তার মরিশাস ইউনিটের হাত দিয়ে। এছাড়াও ১১,২৯,৯৪,২২৮টি শেয়ার এটিসালাটের হাতে আছে, অন্যদিকে একেবারে প্রথম শেয়ারহোল্ডার 'টাইগার ট্রাস্টীস'-এর হাতে আছে ৪৯৫ কোটি মূল্যের ১,৭৩,০১,৪৬৩টি শেয়ার। এই হল সোয়ান টেলিকমের শেয়ার কাহিনী। কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী এ রাজা কিন্তু এখনও নিজের গোঁ ছাড়েননি।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অপসারণ আবশ্যক

আবারও বিতর্কের কেন্দ্রে নির্বাচন কমিশনার নবীন চাওলা। বিগত ২০05 সালের ১৬ মে, যেদিন হইতে তিনি নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন, সেইদিন হইতেই তাহাকে লইয়া বিতর্কের অন্ত নাই।

তেষট্টি বর্ষীয় প্রবীণ প্রাক্তন এই আই এ এস অফিসার শুধু মাত্র যে নির্বাচন কমিশনে অন্তর্ভূক্তির পর হইতে বিতর্কিত তাহাই নহে, ১৯৬৯-ব্যাচের এই আই এ এস অফিসারের সহকর্মী হিসাবে যাহারা সময়ে সময়ে কার্য করিয়াছেন, তাহাদের মনোভাবও মোটেই ইতিবাচক নহে। ১৯৭৫ হইতে’ ৭৭ পর্যন্ত জরুরী অবস্থা চলাকালীন তিনি ইন্দিরাগান্ধী তথা গান্ধী পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বলিয়াই শুধু মাত্র রাজনীতির অঙ্গনে পরিচিত নহেন, সমকালীন আমলাদিগের নজরেও তিনি কংগ্রেসী ঘরাণার বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। অত্যন্ত পটুতার সঙ্গে আইনের বিভিন্ন দিকগুলিকে কিভাবে ধোঁকা দিয়া গান্ধী পরিবার তথা কংগ্রেসীদের স্বার্থে কার্যকর করা যায়, তাহাও তিনি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন — এমন অভিযোগও ইতিপূর্বে উঠিয়াছে।

অবসর গ্রহণের মাত্র দুই মাস পূর্বে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাহাকে নির্বাচন কমিশনের একজন সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করানো হইয়াছে। নির্বাচন কমিশনারের পদ ভারতীয় সংবিধান তথা ন্যায়-নৈতিকতার দিক হইতে একটি অত্যন্ত নিরপেক্ষ পদ বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূর্ত্তির কারণে এই কমিশনের সদস্য হিসাবে যাহার নিযুক্তি তাহার কর্মপন্থা যে অনুরূপ হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। পরবর্তী দৃশ্যগুলিও তাই সেইভাবে চলিতেছে। শ্রী চাওলা নির্বাচন কমিশনার হিসাবে যত না ভাবিত তদপেক্ষা বেশি সক্রিয় কংগ্রেসীদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিতে। ইহা লইয়া বহুবার বিতর্কও উঠিয়াছে। ২০০৬ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামের নিকট অকংগ্রেসী ২০৫ জন সাংসদ শ্রীচাওলার পক্ষপাতদুষ্ট, ঔদ্ধত্যপরায়ণ আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইয়াছিলেন। সত্যি বলিতে কী, ভারতীয় গণতন্ত্রে সাংবিধানিক মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে বোধ করি, এই ধরনের বিতর্কিত তথা অভিযুক্ত ব্যক্তি তিনিই। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনের মতো এমন সাংবিধানিক তথা মর্যাদাজনক পদে বসিয়াও পদটিকে কালিমা লেপন তিনি ছাড়া আর অন্য কেহ এযাবৎ করে নাই। উল্লেখ্য, প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি. এন. শেষণ সম্পর্কে অন্য যাহা কিছু বলা যাক না কেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে যে গৌরবের শীর্ষে উত্তরণ ঘটাইয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণযোগ্য।

কংগ্রেস কোন মুখে বলিতেছে যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদক্ষেপ অন্যায়। তিনি কোনও গা জোয়ারি করেন নাই। রীতি অনুসরণ করিয়াই শ্রী চাওলার বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগের প্ররিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ নিয়েছেন। বিচারের ভার তো রাষ্ট্রপতির হাতে।

নির্বাচন কমিশনার নবীন চাওলার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিবার পর যে দৃশ্য আমরা লক্ষ্য করিতেছি, তাহা কোনও গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে মর্যাদাকর বলা যায় না। নির্বাচনই হইল সেই প্রক্রিয়া যাহা স্বৈরাচার অথবা বংশপরম্পরার শাসন হইতেগণতন্ত্রকে আলাদা করিয়া রাখে। যখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার লিখিতভাবে নিজের সহযোগীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন, তখন তাঁহার বক্তব্যকে উপেক্ষা করা এবং সেইসঙ্গে নবীন চাওলা পরবর্তী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হইবেন বলিয়া আইনমন্ত্রী ভরদ্বাজ-এর বক্তব্য — গণতন্ত্রের প্রতি উপহাস ছাড়া আর কী! কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীর এই বক্তব্য কোনও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দেয়? তাহার এই বক্তব্যের পর, দেশের সাধারণ মানুষের অভিযোগের কথা শোনা হইবে — এমন কথা তো তাহা হইলে ভাবাও যায় না।

আসলে অভিযোগ উঠিবার পর সেই অভিযোগ লইয়া বিচার হওয়া প্রথম দরকার। অভিযোগের বিষয়টি সকলকে জানানো দরকার। কেননা নির্বাচন বিষয়টাই সাধারণ মানুষের অধিকারের আওতায় পড়ে। অভিযোগের বিষয়টি লইয়া সর্বদলীয় বৈঠকেও আলোচনা হওয়া উচিত। কেননা সব রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎই তো নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মের উপর নির্ভর করে। এইসব কিছুই না করিয়া নবীন চাওলা পরবর্তী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হইবেন বলিয়া ঘোষণা করা কতটা যুক্তিযুক্ত? এই বক্তব্যের — একটাই অর্থ, অভিযোগকে শুধু অহংকারের সঙ্গে উপেক্ষা করা নয়, সেইসঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার-এর মতো একটি সাংবিধানিক পদের প্রতিও অমর্যাদা প্রদর্শন করা। এইসব ঘটনা লক্ষ্য করিয়া বুঝা যাইতেছে, সরকারের স্পষ্ট মতলব হইল যে, বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এন গোপালস্বামী এখনই নিজের পদ ত্যাগ করিয়া সরিয়া যান। এইরকম একটি সাংবিধানিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের এই ধরনের সিদ্ধান্ত সংবিধানকে অপমান করা। এখনও সময় আছে। এই লজ্জাকর অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীকেই প্রথমে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ খোলামেলা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আইনমন্ত্রী নিজে নবীন চাওলার পক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লইয়াও আলোচনা হওয়া দরকার। সমগ্র দেশ জানিতে চায় যে কোন কারণে নবীন চাওলাকে নির্বাচন কমিশনার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল? সংবাদ মাধ্যমে নবীন চাওলা সম্পর্কে নানাবিধ অভিযোগ ইতিমধ্যে বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। তাই এত মহত্বপূর্ণ পদে এমন একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির নিযুক্তি গণতন্ত্রের পক্ষে কলঙ্কময় বৈকী। অন্যান্য দলগুলির নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও সরব হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনে সুপ্রীম কোর্টেরও দ্বারস্থ হইতে হইবে। অভিযোগগুলি জনতার কাছে প্রকাশ এবং তাহার যথোপযুক্ত বিচার করিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, যাহাতে আসন্ন নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি দেশের নাগরিকদের আস্থা অটুট থাকে। সময় থাকিতে সরকার যদি উচিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে তো ঠিকই হইবে, অন্যথা ভোটদাতারা নিজেরাই এই বিষয়ের ফয়সালা করিবে।

হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

স্টীফেন ন্যাপ

বহু বছর ধরে আমরা শুনে আসছি যে, ভারতে বিভিন্ন হিন্দুগোষ্ঠীকে খৃস্টান বা মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস চলছে। কিন্তু ভারতে একবার মাত্র প্রবাসকালে আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, অধিকাংশ মানুষ বা বেশিরভাগ ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ চলছে তার ধারণা পর্যন্ত নেই। তাদের ধারণা নেই যে এই সংকট কত গভীর এবং কোনও কোনও স্থানে হিন্দুধর্মের প্রভাব কীভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

২০০১ সালের জুন মাসে প্রবাসের সময়ে আমি প্রতিটি রাতে মুম্বাই, নাগপুর, ওয়ারংগাল, বিশাখাপত্তনম্, বিজয়ওয়াড়া, হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রাম এবং চেন্নাইয়ে ভাষণ দিয়ে বেড়িয়েছি। কাজেই এইসব স্থানের বুদ্ধিজীবী, সাধু-সন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং এঁদের থেকে জানতে পেরেছি যে ধর্মান্তরকরণ বিষয়টা বহু চর্চিত।

আমি ব্যক্তিগতভাবে খৃস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে নই। আমি খৃস্টান সমাজে জন্মেছি এবং বড় হয়েছি, কাজেই আমি জানি এরা কীভাবে কাজ করে। আমার বক্তব্য হল যে, যখন যীশুর প্রেমের কথা বলা হয়, অনেকক্ষেত্রেই তা বিকৃত। এবং যে প্রেমের কথা বলা হয় মানবজীবনের জন্য এবং যা আমরা প্রচার করি তা অনেকাংশেই অপব্যাখ্যা। অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে সারমেয়র মতো চীৎকার করে সমালোচনা করা প্রকৃত খৃস্ট ধর্ম নয়। এর অর্থ হল এই ধর্মের প্রচারকরা অন্যসব ধর্ম এমনকি নিজস্ব ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেও একে অন্যের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়।

এর মধ্যে একটি পন্থা হল খৃস্টানকে ভারতীয় আচার, সংস্কৃতি, প্রতীকের মধ্যে প্রবেশ করানো। তাই আপনারা লক্ষ্য করবেন পদ্মের ওপর ক্রুশ, খৃস্টান যাজকেরা গেরুয়া বসন পরিধান করছে এবং অনেক গীর্জাও মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে খৃস্টানদের কাছে হিন্দুরা আরও আসবে।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণকালে আমি লক্ষ্য করেছি যে, ওইসব রাজ্যগুলিতে খৃস্টান পাদ্রীরা ধর্ম প্রচারের জন্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেবার আড়ালে পলিয়েস্টার কাপড় বিতরণ করছে। এমনকী এরা দামী মোটর সাইকেলও দিচ্ছে, যাতে প্রলোভনের মাধ্যমে আরও বেশি মানুষ ধর্মান্তরিত হয়। নিয়োগী কমিশনের রিপোর্টে এমনও তথ্য মিলেছে যে, মধ্যপ্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুদে ঋণ দিচ্ছে সেখানকার জনগোষ্ঠীকে। এরা যদি তাদের কাজ মেটাতে না পারে তা মকুব করা হচ্ছে যদি তারা খৃস্টান হয় এমন শর্তে। দেশের গণতান্ত্রিক আবহে এবং হিন্দুদের উদাসীনতায় এমন ধর্মান্তরকরণ অবাধে চলছে।

মিশনারীদের আরেক কৌশল হল কোনও অসুস্থকে এমন ওষুধ দেওয়া হয় ওষুধ হিসাবে যার কোনও মূল্য নেই এবং অসুস্থের পরিবারের কোনও একজনকে তাদের আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দিতে বলা হয়। স্বাভাবিকভাবে ভেজাল বা ওষুধ নয় এমন দ্রব্যে রোগ নিরাময় হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মিশনারীরা সঠিক ওষুধ রোগীকে সেবনের জন্য দেয়। রোগী নিরাময় হলে মিশনারীরা যীশুকে পূজা করার উপদেশ দেয়। এবং যখন রোগ নিরাময় হয়ে যায় তখন মিশনারীরা বলে রোগীর সুস্থতার কারণ ওষুধ নয়, তার রোগ সারিয়েছেন স্বয়ং প্রভু যীশু।

এইভাবে জনজাতি বনবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সমাজসেবার নামে ধর্মান্তরকরণ চলছে। আসলে প্রকৃত সমাজসেবা নিঃস্বার্থ হতে হবে, যেখানে বিনিময়ে কোনও কিছুই পাওয়ার আশা করা হয় না। এমনকী ধর্মান্তরকরণেও না।

অন্য এক কৌশল হল কোনও সভায় ব্যাপক নিরাময়ের কেরামতি দেখানো। এরা করে কি, পয়সা দিয়ে মানুষকে এই সভায় আমন্ত্রণ করে। কাউকে অসুস্থ সাজানো হয় এবং এদের অনেকে নকল পঙ্গুত্বের অভিনয় করে। কেউ কেউ কাঁধে ক্র্যাচ নিয়ে আসে এবং তাদের ডেকে আনা হয় এবং তাদের রোগের ওষুধ প্রয়োগ করে নিরাময় করা হয় ‘আশ্চর্যজনকভাবে’ ও দেখানো হয় যে, এই রোগ নিরাময় করা হয়েছে যীশুর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে। এইভাবে বনবাসীদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধর্মান্তরকরণ করা হয়। এইভাবে ব্রাহ্মণদের পরাবর্তন সম্ভব নয়, কিন্তু নীচু স্তরের মানুষদের সহজেই খৃস্টান করা যায় বলেই ভারতের জনজাতি মানুষদের মধ্যে খৃস্টান হওয়ার প্রবণতা প্রকট। সুতরাং বাইবেলের মাহাত্ম্য প্রচার করে এসব জায়গায় ধর্মান্তর করা হয় না। ধর্মান্তর করা হয় কেবলমাত্র কৌশলে অথবা টাকা-পয়সা খরচ করে। এ ধরনের অপকর্মে প্রায়শই হিন্দুরা বাধা দেয়। যদি এই ধর্মান্তর কোনও উপায়ে ঘটে তাহলে বলার কিছু থাকে না।

অন্য একটি মজার ব্যাপার হল এই যে, খৃস্টানরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দ্বারা এই ধর্মান্তরকরণ প্রতিহত করার প্রচেষ্টাকে প্রবলভাবে বাধা দিয়ে আসছে। দেখে শুনে মনে হয়, চার্চ ছাড়া ধর্মান্তরকরণে অন্য কারুর অধিকার নেই। নাগাল্যাণ্ড ব্যাপটিস্ট মিশনের সচিব সদর্পে বলেন, “যদি কেউ তার বিশ্বাস (ধর্ম) জোর করে চাপিয়ে দিতে চায় তা খৃস্টানরা বরদাস্ত করবে না, খৃস্টানরা এদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। সংঘর্ষ ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই আমাদের সামনে। উত্তর পূর্ব অঞ্চলে যদি জোর করে পরাবর্তন করা হয় সমস্ত রকম উপায়ে বলপূর্বক তা প্রতিহত করা হবে”। রেভ এম ডি ওয়াগমা একই সুরে বললেন, “খৃস্টান ধর্ম বিপন্ন। যদি ভি এইচ পি পরাবর্তন চালিয়ে যায় তাহলে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চার্চ ভি এইচ পি-র এই গেমপ্ল্যান রুখবে”। এম ভি ওয়াবামা হলেন মেঘালয়ের গারো ব্যাপটিস্ট কনভেনশনের কর্ণধার।

> **“দেখে শুনে মনে হয়, চার্চ ছাড়া ধর্মান্তরকরণে অন্য কারুর অধিকার নেই। নাগাল্যাণ্ড ব্যাপটিস্ট মিশনের সচিব সদর্পে বলেন, “যদি কেউ তার বিশ্বাস (ধর্ম) জোর করে চাপিয়ে দিতে চায় তা খৃস্টানরা বরদাস্ত করবে না, খৃস্টানরা এদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। সংঘর্ষ ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই আমাদের সামনে। উত্তর পূর্ব অঞ্চলে যদি জোর করে পরাবর্তন করা হয় সমস্ত রকম উপায়ে বলপূর্বক তা প্রতিহত করা হবে”।”**

অবশ্য হিন্দুদের পরধর্ম সহিষ্ণুতার কারণ হল যে, এরা মনে করে প্রতিটি অধ্যাত্ম মত ও পথের লক্ষ্য হল ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা। তাই এই প্রেক্ষিতে সকলের প্রতি উদার হও এবং অন্যকে বাড়তে দাও। কিন্তু অন্য ধর্মগুলির দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অনেকে মনে করে হিন্দুত্ব এক সংস্কৃতি, তাই একে ধবংস করা হোক। একটা উদাহরণ হল, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অসম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুরে গত ২৫ বছরে খৃস্টান জনসংখ্যা বেড়েছে ২০০ (দুশো) শতাংশ। এদের প্রভাব এতটা সুদৃঢ় যে, অনেক অঞ্চলে হিন্দুধর্ম পালন করা নিষেধ। এটা কি গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা? এইসব এলাকায় মানুষ প্রকাশ্যে তাদের উপাস্য দেবতার পূজা করতে পারে না বা আরতি করতে পারে না, কারণ ধর্মান্ধতা। এইসব এলাকায় দুর্গাপূজা বন্ধ হয়ে গেছে অথবা প্রকাশ্য দিনের আলোয় দেবীমূর্তি চুরি হয়ে যায় বা ভেঙ্গে ফেলা হয়। এই সংঘাতময় বাতাবরণে খৃস্টানরা জঙ্গি তৈরি করছে যারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে। সুতরাং বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের মানচিত্র থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে। এমন গতিবিধি যদি অব্যাহত থাকে তো দেশ বিভাজন অচিরেই আরেকবার ঘটবে।

বিশেষত যদি ক্যাথলিক চার্চ এমন প্রচার চালায় যে, ঈশ্বরই প্রেম এবং এই ঈশ্বরের প্রেম-ই জগৎ রক্ষা করছে — এটা যদি সত্য হয় তবে তা অন্য ধর্মের প্রতি করুণা প্রদর্শনের প্রয়োজন হত না। পোপ যেভাবে এশিয়ায় ধর্মান্তর-করণের ফতোয়া জারি করেছেন তাতে মনে হয় না তিনি অন্য ধর্মের হিতসাধক বন্ধু, বরং এতে মনে হয় তাঁর ইচ্ছা হল অন্য ধর্মকে খতম করে বিশ্ব জুড়ে খৃস্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা। এই কথাটা পরিষ্কারভাবে মনে রাখতে হবে। এটা সমানভাবে সত্য ব্যাপটিস্ট মিশনের ক্ষেত্রেও।

আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম সেখানে শান্তি রেড্ডি র সঙ্গে পরিচয় হয় এবং উনি সরকারী সংস্থা ন্যাশনাল কমিটি ফর উইম্যানম-এর সদস্যা। তিনি এক ভয়াবহ তথ্য দিলেন। মিশনারীরা এখন ভারতীয় তরুণদের অপহরণ করছে। চেন্নাইয়ে এমন এক খৃস্টান দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা হাতেনাতে ধরা পড়ে যখন এক আদিবাসী দম্পতির কাছ থেকে ঘুষ দিয়ে তাদের কন্যা সন্তানকে ছিনিয়ে নেয়। তারা কন্যা শিশু সন্তানদের কেনে মাত্র ২০০০-৫০০০ টাকায় এবং বিদেশে তা বিক্রি করে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার ডলারে। সূত্র অনুসারে এইসব তথ্য পাওয়া গিয়েছে মিশনারীদের হেফাজত থেকে এবং এই ব্যবসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরকম ২৫টি সন্তান ক্রয় বিক্রয়ের ঘটনা নজরে এসেছে। ভারতীয় সরকারি সূত্রের তথ্য অনুসারে এরকম ৩০০টি কন্যা সন্তানের কেনা-বেচার ঘটনা আঁটকানো গেছে। সুতরাং এমন বেআইনি কুকর্ম ভারতে ধর্মান্তরকরণের অন্যতম আরেকটা পদ্ধতি। যখনই হিন্দুসমাজ থেকে প্রতিরোধ আসে তখনই এদের গায়ে সাম্প্রদায়িক, পরধর্ম অসহিষ্ণুতার তকমা সেঁটে দেওয়া হয়। কিন্তু আপনি কীভাবে চুপ করে বসে থাকবেন যখন এমন কুকর্মের মাধ্যমে মিশনারীরা ধর্মান্তরকরণ চালিয়ে যাবে? এইসব ঘটনা হিন্দুদের সহিষ্ণুতার সীমা লঙ্ঘন করিয়ে আক্রমণ হানতে উস্কানি দেয়।

(এরপর ১৫ পাতায়)

কেরলের মারাড-এ হত্যাকাণ্ড

অভিযুক্ত ৬২ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ২৫ জানুয়ারি কেরলের কোঝিকোডে এক বিশেষ আদালত মরাড নরসংহার মামলায় অভিযুক্ত ৬২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে। কেরলের কোঝিকোডে মৎস্যজীবী অধ্যুষিত মরাডে গত ২০০৩-এর ২ মে রাতে ৮ জন হিন্দুকে নৃশংসভাবে মুসলিম দুস্কৃতীরা হত্যা করে। আদালত বাকি অভিযুক্ত ৭৬ জনকে প্রমাণাভাবে মুক্তি দিয়েছে। বিশেষ আদালতের বিচারপতি ম্যাথু পি যোসেফ এই রায় দেন।

ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০২, ৩০৭, ১৪৭, ২৪৮ এবং ১৪৯ ধারা অনুসারে ৬২ জন অভিযুক্তকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। মরাড মসজিদ সমিতির সচিব লতিফ, যে ওই দিন ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছিল, উপাসনাস্থল অপব্যবহারের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড মরাড ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সেসময় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যা ভয়াবহ দাঙ্গার দিকে মোড় নিতে পারতো।

২০০৩ সালে ঘটা এই নরসংহার কান্ডের বিচার করতে গিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন এমন কয়েকটি মন্তব্য করেছেন যা বিস্ময়কর এবং কোনও উচ্চস্তরীয় কেন্দ্রীয় এজেন্সীর মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আরও অনুসন্ধানের জন্য সুপারিশ করেছেন। এই ষড়যন্ত্র থেকে লাভ তোলার জন্য সিপিএম, মুসলিম লীগ ও এন ডি এফ-

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন বিচারপতি বাবু ম্যাথু যোশেফ ও অন্যান্যরা।

এর মতো রাজনৈতিক দলগুলির সন্দেহজনক ভূমিকারও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন আরও বলেছেন, মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতৃত্ব এই ষড়যন্ত্রে সামিল ছিল। আদালত এমন কয়েকজন জননেতা ও পুলিশ অধিকারীর নামোল্লেখ করেছেন যারা ওই হিংসাত্মক ঘটনা প্রতিরোধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। উপরন্তু পরোক্ষভাবে মদত যুগিয়েছে বলে অভিযোগ। এই নৃশংস হত্যাকান্ডের সিবিআই-কে দিয়ে তদন্ত না করানোর জন্য কমিশন তৎকালীন ইউ ডি এফ সরকার, মুসলিম লীগকে ভর্ৎসনা করেছেন। পর্যবেক্ষকদের অভিমত, ক্ষমতাসীন সিপিএম হত্যাকারীদের প্রতি বরাবরই নরমনীতি গ্রহণ করে এসেছে।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে সরকারের সঙ্গে যে সমঝোতা হয়েছিল তারই ফলে নিহত ৮জন হিন্দু মৎস্যজীবীর প্রত্যেক পরিবারকে দশ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং প্রতি পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরিও দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর অভিমত, সঙ্ঘের সক্রিয় নেতৃত্বের ফলেই তারা এই সুবিচার পেয়েছেন। স্বভাবতই এই রায়ে তারা খুশি হয়েছেন।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে চলেছে

(১ পাতার পর)

৩৬.৩৫, ফলতা ৩১.৮০। এই হিসাব ২০০১ সালের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার 'ব্লক ভিত্তিক ধর্মীয় জনসংখ্যার শতকরা হিসাব' সূত্রে পাওয়া। এরপর আরও ৮ বছর কেটে গিয়েছে। এই সময়কালে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশ নিরন্তর হয়েই চলেছে। জেলার সংলগ্ন সমুদ্র উপকূল দিয়েও অনুপ্রবেশ হচ্ছে। সব মিলিয়ে মুর্শিদাবাদ, মালদহের মতো অচিরেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় পরিণত হবে। আর হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হলে 'বৃহত্তর বাংলা' বা 'মুঘলিস্তান'-এর পরিকল্পনা যে বাস্তবায়িত হতে সময় নেবে না তা বুঝতে দিব্যজ্ঞান নয়, সামান্য কাণ্ডজ্ঞানই যথেষ্ট।

ব্লক ভিত্তিক ধর্মীয় জনসংখ্যার শতকরা হিসাব
দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা

ব্লক	ধর্ম	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
সোনারপুর	হিন্দু	৮৬.২৩	৮৫.২১	৮০.২৬
	মুসলিম	১২.৬৪	১৩.৬৯	১৭.৬৯
মহেশতলা	হিন্দু	৬৭.৮৪	৬৯.৯১	৬৬.০৯
	মুসলিম	৩১.৬৭	২৯.২৫	২৮.৪৬
কুলতলি	হিন্দু	৭৭.০২	৮১.০৬	৭৩.২৩
	মুসলিম	২২.৩৮	১৮.১৭	২৬.৬৬
বারুইপুর	হিন্দু	৭১.৮৩	৬৭.৬০	৬৩.৫৪
	মুসলিম	২৭.৫৩	৩১.৫৪	৩৫.৪৩
বিষ্ণুপুর (১-২)	হিন্দু	৭১.২০	৭৯.৭৬	৬৫.০৬
	মুসলিম	২৫.৫৪	১৬.৯৮	৩২.১৬
বজবজ (১-২)	হিন্দু	৭৪.৫৬	৬৭.৫২	৬৫.০১
	মুসলিম	২৫.১০	৩২.৪২	৩৪.৯২
গোসাবা	হিন্দু	৯১.৮৪	৯১.৪৭	৯০.০৩
	মুসলিম	৬.৬২	৭.২৫	৮.৪৮
মন্দির বাজার (১-২)	হিন্দু	৭৩.২৬	৬৯.৯৪	৬৫.৭৯
	মুসলিম	২৫.৮৫	২৯.৯৮	৩৩.৯১
কুলপি	হিন্দু	৭১.৬২	৬৭.৯৩	৬৩.২২
	মুসলিম	২৭.৯৬	৩১.৬৪	৩৬.৩৫
ফলতা	হিন্দু	৭৫.০৭	৭১.৩৯	৬৮.১২
	মুসলিম	২৪.৮৪	২৮.৫৩	৩১.৮০
ডায়মন্ড হারবার (১-২)	হিন্দু	৬৮.৭৮	৬০.৯৮	৫৭.৮৯
	মুসলিম	৩১.১৫	৩৮.৫৫	৪২.০১

(সূত্র ঃ সেন্সাস রিপোর্ট অফ ইন্ডিয়া ঃ ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১)

ব্যুমেরাং হতে পারে

(১ পাতার পর)

ভবানীপুর এবং পশ্চিম বেহালায় গত ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল নেত্রী গড় ভোটের হিসাবে কিছুটা এগিয়ে ছিলেন। বিগত সেই নির্বাচনে মমতা ৯৮,০০০ ভোটের ব্যবধানে সিপিএম প্রার্থী রবীন দেবকে হারিয়ে ছিলেন। কারণ, তখন দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা আসনের সঙ্গে যুক্ত ছিল বাম বিরোধী বিধানসভা কেন্দ্রগুলি — যেমন চৌরঙ্গী, বালিগঞ্জ, আলিপুর, রাসবিহারী, টালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া এবং সোনারপুর। এবার কিন্তু তেমন অনুকূল পরিস্থিতি নেই। মনে রাখতে হবে যে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত পশ্চিম বেহালা বিধানসভা আসনটিতে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ চট্টোপাধ্যায় মাত্র চার হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। এই ব্যবধান লোকসভার ভোটে মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। তাছাড়া রাসবিহারী ও ভবানীপুর এলাকায় তৃণমূলের কিছুটা প্রভাব আছে। কিন্তু জেতার পক্ষে সেই প্রভাব কতটা সফল হবে তা আগাম বলা সম্ভব নয়। সন্দেহ নেই দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা আসনের পুনর্বিন্যাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে মমতার। এই আসনটিতে ১৯৯১ সাল থেকে টানা পাঁচবার জয়ী হয়েছেন তিনি। কিন্তু এবার তাঁর জয় সহজসাধ্য হবে না। মমতার 'একলা চলো' নীতি এবার ব্যুমেরাং হয়ে পতন ডেকে আনলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে সিপিএমের কৃষিজমি জবরদখল করার নীতির বিরোধিতায় গণ-আন্দোলনের সাফল্য তৃণমূলের একার নয়। আন্দোলনে একটা বড় ভূমিকা বিজেপি-র সংসদীয় দলের প্রতিনিধিরা নন্দীগ্রামের অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একমাত্র বিজেপিই সংসদে এই নরহত্যার প্রতিবাদে সি পি এমকে কোণঠাসা করেছে। একমাত্র বিজেপি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস নয়। অথচ এখন তিনি দাবি করছেন যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে তৃণমূল একাই সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এর থেকে বড় তঞ্চ কতা আর কী হতে পারে।

তাই পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী জোট না হওয়ার জন্য দায়ী একমাত্র মমতাই। দ্বিতীয় অন্য কেউ নয়।

রাজ্য রাজনীতি

বিমানবাবুর পার্টির পচনের স্বীকারোক্তি 'ইলেকশন গিমিক'

লোকে ভাববে পার্টি এবার শুদ্ধ হচ্ছে

নিশাকর সোম

পূর্ব মেদিনীপুরে সিপিএম জেলা কমিটির নিজস্ব বাড়ির উদ্বোধন হল। ১৮ হাজার বর্গ ফুটের জমিতে বাড়ি। খরচ হয়েছে এক কোটি টাকারও উপর। এই অট্টালিকা উদ্বোধন এবং পূর্ব মেদিনীপুরের পার্টির সাংগঠনিক কনভেনশনে যোগ দিতে গেছিলেন সিপিএম-এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিমান বসু। তিনি রিপোর্ট পেয়েছেন — পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পার্টির প্রতিটি স্তরের সাংগঠনিক কনভেনশনে পার্টি নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অভ্রংলেহি আচরণ এবং বিপুল বৈভবের কথা উঠেছে। এই রিপোর্টে বিমান বসু এতটাই আতঙ্কিত এবং উত্তেজিত হয়েছেন যে, তিনি পার্টি অফিস উদ্বোধনের প্রকাশ্য সভার মধ্যে লক্ষ্মণ শেঠ এবং তমালিকা শেঠ পান্ডাকে আসীন দেখে বলেন — 'আগে যাঁরা একটা বিড়ি চারবারে খেতেন এখন তাঁরা বড় বড় সিগারেট খাচ্ছেন। কারুর আচার-আচরণ রাজা-মহারাজার মতোন। পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে তিনি নিজের পাঞ্জাবীর একটা সেলাই করা অংশ দেখিয়ে বলেন — এটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, আমি সেলাই করেছি। তিনি আরও বলেন — আগে যারা ছেঁড়া জামা কাপড় পরতেন এখন তাঁরা এবেলা-ওবেলা পোশাক পরিবর্তন করেন। তিনি বলেন — আগের মহিলা কর্মীরা ছেঁড়া কাপড় পরে কাজ করতেন। এখন দেখি মহিলারা সকালে একটা পোশাক, রাত্রিতে আর একটা পোশাক পরছেন। তিনি আরও বলেন, জনসাধারণ এসব দেখছেন। লোকেদের বোকা ভাবার কারণ নেই, পার্টি সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে পার্টির ক্ষতি হচ্ছে। পার্টি সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে।" তিনি ইঙ্গিত করেন লক্ষ্মণ শেঠ গোষ্ঠীকে — লক্ষ্মণ শেঠ মনোনয়ন নাও পেতে পারেন।

সিপিএম-এর পচনের কথা এই কলামে বহু আগেই বলা হয়েছে। যেগুলি আজ বিমান বসুর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দমদমে সিপিএম পার্টির দু'জন আঞ্চলিক নেতা সুজিত দাশগুপ্ত এবং সঞ্জিত দাশগুপ্ত আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। পুলিশ বলছে — এটা সমাজ বিরোধীদের দ্বন্দ্বের ফল। কোনও কোনও মহল — এটা সিপিএমের গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের ফল, হিংসার ভাগের ঝগড়ার পরিণতি বলছেন। দমদম-এর সাংসদ এই খুনের দ্রুত নিষ্পত্তি করার দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক হত্যাকান্ড অথবা রাজনৈতিক নিরুদ্দেশ কোনওটারই এই মন্ত্রিসভার আমলে হয়নি। সিপিএম-এর রাজ্য দপ্তরের নিরীহ বৃদ্ধ কর্মী সুশীল চৌধুরীকে হত্যা করা হয়, মৃত্যুর পরও তাঁর হাতে ঘড়িটি সচল ছিল! এই হত্যার কোনও কিনারা হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী মনীষা মুখার্জি নিখোঁজ হলেন — প্রায় দুই দশকেও তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না। অতীতে নিহত হেমন্ত বসু, অজিত বিশ্বাস ও নেপাল রায় হত্যার মামলা শেষমেশ ধামা চাপা পড়ে যায় কেন? সিপিএম-এর শিক্ষক নেতা রথীনকৃষ্ণ দেব-কে কারা হত্যা করতে গেছিলেন? কেন?

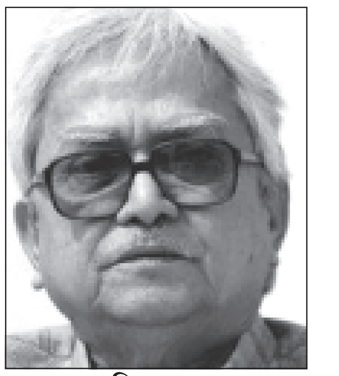

বিমান বসু

লক্ষ্মণ শেঠ

সুভাষ চক্রবর্তী

আজকে সিপিএম-এর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যে খুনো-খুনিতে পরিণত হবে, তা আগেই লেখা হয়েছিল। এই গোষ্ঠীবাজি সিপিএম-এর উপরতলাতেই চলছে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বর্ধমান গ্রুপ একের পর এক গণসংগঠনের নেতৃত্ব কব্জা করে ফেলছে। নিকট অতীতে রাজ্য যুব সংগঠনের নেতৃত্ব বর্ধমান গোষ্ঠীর কবলে চলে গেছে। রাজ্যের কৃষক সভার নেতৃত্ব বর্ধমান গোষ্ঠীর করায়ত্ত। নিরুপম সেন-মদন ঘোষ-বিনয় কোঙার- এই ত্রয়ী নাকি সব কলকাটি নাড়াচ্ছেন?

পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব বস্তুত সুভাষ চক্রবর্তীকে উত্তর ২৪ পরগণা থেকে সরিয়ে, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় পার্টি সংগঠন দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন। কারণ সুভাষবাবুই এই জেলাতে পার্টি ভাঙিয়ে পি ডি এস তৈরিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি সমীর পুততুন্ডকে বলেছিলেন, তিনি এই নতুন পার্টিতে যাবেন। এসব সত্ত্বেও সুভাষবাবু প্রমোশন পেয়ে সম্পাদকমণ্ডলীতে স্থান করেছেন।

উত্তর ২৪ পরগণাতে পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্বের অন্যতম প্রেরণাদায়ক সুভাষবাবু কি নন? বিমানবাবু কী বলেন? বিমানবাবু বলতে পারেন, রণজিৎ মিত্র ও রণজিৎ কুন্ডুরা কেন সামনে আসতে পারছেন না?

দমদম কান্ডে ধরা পড়াদের মধ্যে সিপিএম-এর যুব সংগঠনের এক প্রাক্তন নেতা আছেন। পুলিশ সূত্রে এ সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে তা'হল প্রমোটারির টক্করের ফল এই হত্যাকাণ্ড। পার্টিতে এখন না খাওয়া-না-পাওয়াদের সঙ্গে অধিক ভোজনে তৃপ্ত বৈভবেদীপ্তদের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব মেটার নয়।

বিমানবাবুর অজানা থাকতে পারে কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি তথা সিপিএম-এ গোষ্ঠীবাজি জন্মলগ্ন থেকেই আছে। আজকে কেরলের পার্টির দ্বন্দ্ব নিয়ে নানা কথা কলকাতার দৈনিকে লেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেরলে নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা চলাকালীন বৃটিশ সাংবাদিক তারা জিনকিন কেরলের বিভিন্ন নেতাদের সাক্ষাৎকার নেন। সেই সাক্ষাতকার তারা জিনকিন-এর "রিপোর্টিং ইন্ডিয়া"-তে লিপিবদ্ধ আছে। সেখানে যা লেখা আছে তাঁর কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করছি — প্রথমেই জানাই তখন কেরলের পার্টির সম্পাদক ছিলেন এম-এন গোবিন্দন নায়ার। তিনি চীনে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত সর্দারকে এম পানিক্কর-এর জামাই। সর্দার পানিক্কর একজন ইতিহাসবেত্তা। যাক সে কথা — এই এম-এন গোবিন্দন নায়ার-এর কাছ থেকে যা শুনেছেন বলে দাবি করে মিসেস জিনকিন লিখেছেন তা হল — (১ এ কে গোপালনকে "বুদ্ধু" বলে অভিহিত করা, (২) নাম্বুদ্রিপাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে — আপাতদৃষ্টিতে সাধু লোক বলে মনে হলেও তিনি অতি ধূর্ত এবং কুটিল।" আমি আর উদ্ধৃতি দিলাম না, উল্লেখ করি, তারা জিনকিন হলেন ভারত সরকারের অর্থ দপ্তরের সচিব ফিলিক্স জিনকিনের পত্নী।

পশ্চিমবঙ্গের একটা ঘটনা উল্লেখ করি। অধুনালুপ্ত দর্পণ পত্রিকার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বে সম্পর্কে এক সংবাদে লেখা হয় — "নিরঞ্জন সেনের মাথাটা নিরেট — মাথায় ইট মারলে ইটটাই ভেঙে যাবে।" বলেছিলেন নিরঞ্জন গোষ্ঠীর বিরোধী জনৈক নেতা। তিনি আজ মৃত। নিরঞ্জন সেন ছিলেন মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় অভিযুক্ত। তিনি প্রমোদ

(এরপর ৬ পাতায়)

অন্য রকম

জীবন যুদ্ধের ছাত্র

কষ্ট না করলে যে কেষ্ট মেলে না, তা তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করেছেন। স্কুলের পাট চুকিয়ে দিয়ে কম বয়সেই জীবন-যুদ্ধে নামতে হয় তাকে। তখন বয়স মাত্র ১২ বছর। সেই বয়স থেকেই নিজে কিছু করার ভূত চেপেছিল তার ঘাড়ে। বাবার ডেয়ারি ব্যবসা থাকলেও সেই ব্যবসায় ভাগ বসাননি তিনি। উল্টে নিজে বড় ব্যবসায়ী হবার স্বপ্ন দেখেছেন। বাবার দেওয়া এক'শ টাকাকে আশীর্বাদ রূপে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। ১০০ টাকা নিয়েই মাঠে নেমে পড়েন অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রান্ধি সুবারাও। মাত্র এক'শ টাকা থেকে আজ তিনি কোটিপতি। তবে এসব এক দিনের নয়। সুপারি ব্যবসা করার ভাবনাটা সেই বয়সেই মাথায় আসে তার। ঠিক করেই ফেলেছিলেন এই ব্যবসাতেই বড়ো হবেন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবেন। সুবারাও আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত। সমাজে তার পরিচয় একজন সৎ ব্যবসায়ী রূপে।

ব্যবসার শুরুতে পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে কষ্ট করে গেছেন তিনি। সুবারাও কখনও বাবার কাছে সাহায্য চায়নি। প্রথম প্রথম ক্ষুদে ব্যবসায়ীর দিকে অনেকেই দেখেও না দেখে চলে যেত। তাই বলে আশাহত হননি সুবারাও। উৎসাহ উদ্দমেও ভাটা পড়েনি। ছোটো বলে কখনও সুযোগের ফায়দা তোলেননি তিনি। সুপারি ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে বয়সও বাড়তে থাকল তার। কম বয়সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কম হল না।

একটু বয়স বাড়তেই সাইকেলে করে সুপারি ফেরির কাজ শুরু করলেন। অনেকে কিনত, অনেকে মুখের সামনেই দরজা বন্ধ করে দিত। তবুও হাল ছাড়েননি সুবারাও।

সুবারাও

ফেরির কাজ চালিয়ে গেছেন সমান তালে। কী গ্রীষ্ম,কী বর্ষা কোনও ঋতুতেই বিশ্রাম নেননি। সুপারি ফেরির সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধি তেল ও রান্নার মশলা বিক্রি শুরু করলেন সুবারাও। বিক্রি আগের থেকে একটু বাড়ল। হাতে কাঁচা টাকাও আসতে শুরু করল। সুবারাও সেটাকে বাজে রাস্তায় ব্যয় না করে, সে টাকা আবার ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে লাগলেন। এদিকে বড় বড় দোকানেরও অর্ডার পেতে লাগলেন তিনি।

সুবারাও খুচরো সুপারি বিক্রি না করে, মোড়কে মোড়া সুপারি বিক্রি শুরু করলেন। নাম রাখলেন 'ক্রেণ' ব্যান্ড। 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী' কথাটার সারমর্ম তিনি নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন।

সুবারাও-র বয়স বেড়েছে। তার বাবাও বুঝেছেন সুবারাও সফল ব্যবসায়ী। ডেয়ারি ফার্ম-এর দায়িত্ব তিনি ছেলের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। সুবারাও-র অধীনেই আজ অনেকে কাজ করছে। তাদের অনেকে আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত। স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলেও, জীবন যুদ্ধের সংগ্রামে তিনি সফল। আজ তিনি নিজেই অফিসের বস। বাইকের শক্ত সিট থেকে অফিসের নরম গদির মালিক সুবারাও।

এত সবের পরও সুবারাও সেই আগের মতোই সহজ-সরল। কারও ওপর বসিং করা তার অভ্যাস নয়, বরং সকলের মাঝে সৎ ব্যবসায়ী হিসাবে বাঁচার স্বপ্ন তিনি আজও দেখেন।

ক্ষমতায় ফিরলেন হাসিনা বাংলাদেশে হিন্দু-নির্যাতন কমবে কি ?

প্রতিবেদক।। বাংলাদেশের রাষ্ট্র চরিত্র কি হবে তাই নিয়ে জল্পনা চলছে। এই ব্যাপারে শাসক জোট দ্বিধাবিভক্ত, জনমতও তাই। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে ফিরে যেতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের বিজয় শেষ কথা নয়। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র চরিত্র গঠন সম্ভব কিনা সেটাই বড় কথা ও বর্তমানে তা আলোচ্য বিষয়। এককভাবে নির্বাচনে গরিষ্ঠতা পেয়েছে হাসিনার দল। সুতরাং গুরুত্ব কমে গেছে সাতাশ আসন পাওয়া এরশাদের জাতীয় দলের। তিন আসন পাওয়া ওয়ার্কার্স পার্টিরও একই অবস্থা। হাসিনার সমস্যা অনেক। মৌলবাদ বিরোধী শক্তিকে দমাতে হবে। ভারতের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতে হলে, দেশের রাষ্ট্র চরিত্র পাল্টাতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। এরশাদ '৮২ সালে প্রকাশ্যে ঘোষণা করছিলেন 'ইসলাম ও কোরানের নীতি হবে নতুন সংবিধানের ভিত্তি'। ৮৮' জুনে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অবশ্য এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল আরও আগে। মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম নেতা ছিলেন জিয়াউর রহমান। কিন্তু তিনি ক্ষমতা দখল করার পর সংবিধান পরিবর্তন করেন। '৭৭-এর ২৩ এপ্রিল সংবিধান থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। এরশাদ দেন পূর্ণাহুতি। এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে, এরশাদের শাসনকালে অর্থাৎ ১৯৮১ থেকে ১৯৮৯ সন অবধি বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত হামলা হয়েছে সংখ্যালঘুদের উপর। সংঘর্ষের ঘটনা একটিও নেই। স্রেফ একতরফা হামলা, ফলে ওই সময়কালে ছত্রিশ লক্ষ হিন্দু দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন।

খালেদা জিয়ার শাসন কালেও একই ঘটনা ঘটতে থাকে। বিরানববইতে ভারতে রামমন্দির নির্মাণ আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। ওই বছর ডিসেম্বর মাসে বিতর্কিত বাবরি কাঠামো ধ্বংস হয়। পাল্টা হিসাবে বাংলাদেশে ধ্বংস হয় তিন হাজার পাঁচশ মন্দির।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে পদযাত্রা। (ফাইলচিত্র)

২০০০ সালে বি এন পি আবার জয়ী হয়। দীর্ঘ দেড় মাস যাবৎ চলে সংখ্যালঘু নির্যাতন। এদের অপরাধ এরা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে ধাপে ধাপে সংখ্যালঘুরা দেশ ত্যাগ করেছেন। রাষ্ট্র চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষ নয়, হামলা, সম্পত্তি দখল, সব মিলিয়েই এই দেশত্যাগ। উনিশ'শ একান্নতে আজকের বাংলাদেশ তথা সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল বাইশ শতাংশ। ১৯৯১-এ এই সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় দশ শতাংশে। বর্তমানে ছয় শতাংশ মাত্র।

১৯৯৪ ঢাকা থেকে প্রকাশিত Holiday পত্রিকা Missing Population শিরোনামে লিখেছে, "As many as 475 Hindus are disappearing everyday from the soil of Bangladesh on as average since 1974" খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল ৯৪' সাত জানুয়ারি। প্রতিদিন চারশ পঁচাত্তর জন হিন্দু সোনার বাংলা ছাড়ছেন। এ লজ্জা কার? লেখক সালাম আজাদ তার এক বইতে লিখেছেন, "রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ঘোষণার পর মৌলবাদীরা ঘোষণা করে যে, এদেশে থাকতে হলে সবাইকে মুসলমান হতে হবে"। বর্তমান অবস্থা পাল্টায়নি। সংখ্যালঘুদের দেশ ত্যাগ এখনও অব্যাহত আছে।

আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্রের কোনও ধর্ম থাকতে পারে না, রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ । কিন্তু রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করতে হলে, হাসিনা বাধা পাবেন নিজ দলের একটি অংশ থেকেও। বাধা আসবে সেনাবাহিনী, বি ডি আর, প্রশাসনের একটি অংশ থেকে। বি এন পি হতমান হলেও উস্কানি দেবে। হাসিনা কী করেন সেই দিকে তাকিয়ে সবাই। '৯২-এ একের পর এক হিন্দু মন্দির যখন ভাঙ্গা হচ্ছিল, তখন অঘটন ঘটিয়েছিল ঢাকার কতিপয় বুদ্ধি জীবী। মন্দির ভাঙার বিরুদ্ধে তারা মিছিল করেছিলেন। অন্যতম স্লোগান ছিল, "মন্দির ভাঙে যারা, ইসলামের শত্রু তারা"। শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই হয় তো সে দেশকে নতুন পথ দেখাবেন।

ইলেকশন গিমিক

(৫ পাতার পর)

দাশগুপ্ত ও পান্নালাল দাশগুপ্ত — এই দুই ভাইকে রাজনীতিতে এনেছিলেন। এতো কথা শুনে পাঠক হয় তো ভাবছেন, ধান ভাঙতে শিবের গীত কেন? কারণ একটাই— কমিউনিস্টদের খেয়োখেয়ি চলেছে-চলছে-চলবে। বিমানবাবু পূর্ব মেদিনীপুরের পার্টি-অফিস উদ্বোধন সভায় যা বলেছেন তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা যায় বিমানবাবুর এই অনুভূতিতে আসতে তিন দশক পার হতে হল কেন? নাকি তিনি মরুঝড়ে উটের মতোন মাথা নিচু করেছিলেন — ভেবেছিলেন ঝড় পার করে দেবেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, দেশহিতৈষীর সম্পাদক প্রয়াত সুধাংশু দাশগুপ্ত (পালিত নয়) এক পার্টি ক্লাসে বলেছিলেন "পার্টিটা একটা বিরাট জাহাজ, তাতে দু-একটা ধেড়ে ইঁদুর ঢুকে পড়েছে, কিছু গর্ত করেছে।"

বিমানবাবুর অবলোকন শক্তি কি কম? তিনি কি তাঁর আশেপাশে যাঁরা বসে থাকেন — তাঁদের কি দেখেননি? বিড়ি থেকে ক্লাসিক সিগারেটে উত্তরণ তো বিমানবাবুর পাশেই আছে। পার্টির কর্মী নেতারা বৈভব-বিত্তধারী হল কি করে তাও অজানা বিমানবাবুর? বিমানবাবু মাফ করবেন, আপনার ধৈয্য পরীক্ষা চলছিল নাকি?

রাজ্য কমিটির অধীনে সরাসরি যুক্ত পার্টি ইউনিটের সাধারণ সভায় স্বীকার করেছেন পার্টির এহেন পচে যাওয়া অবস্থা। তিনি বলেছেন, সাহস করে পার্টির অভ্যন্তরে এ-কথা বলুন। এখানে আবার একটা আন্তর্জাতিক ঘটনা মনে এলো। সোভিয়েত নেতা শাসক স্তালিনের মৃত্যুর পর পার্টির বিংশতি কংগ্রেস রিপোর্টে পেশ করতে গিয়ে — সোভিয়েত পার্টির তদানীন্তন সাধারণ-সম্পাদক নিকিতা সার্গিয়েভ খ্রশ্চভ স্তালিনের বহু অত্যাচারের কাহিনী বলছিলেন। এও বলেছিলেন স্তালিন নাকি তাঁকে গোপাক নাচ নাচতে বাধ্য করেছিলেন।" এই সময়ে ওই পার্টি কংগ্রেসের জনৈক প্রতিনিধি চীৎকার করে বলেছিলেন "আপনি তখন কী করছিলেন? ঘুমাচ্ছিলেন?" তখন খ্রশ্চভ বলেন, একথা যে বললেন, উঠে দাঁড়ান। কেউ উঠে দাঁড়াননি। তখন খ্রশ্চভ আবার বলেন, তখন সমালোচনা করলে গলা কাটা হত, এখন সে ভয় নেই।"

প্রসঙ্গত চীনের নেতা মাও তুং বলেছিলেন, "পার্টির সদর দপ্তরে কামান দাগো। কারণ ওখানেই সমস্ত দুষ্টচক্র আছে। বিদ্রোহ করাটাই সঠিক।" সে রামও নেই — সে অযোধ্যাও নেই।

সম্প্রতি বাগুইহাটিতে বে-আইনি অস্ত্রাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ধৃত অনুপম চৌধুরী নাকি বলেছেন — সিপিএম-এর কর্মীরা তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনতেন।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া আহত ব্যক্তির পকেট থেকে এ কে ৪৭-এর বুলেট পাওয়া গেছে। রাজ্যে খুন-জখম, রাহাজানি, ব্যাঙ্ক লুঠ-ডাকাতি বেড়ে গেছে। পুলিশমন্ত্রী কী করছেন? বলাইবাহুল্য পুলিশমন্ত্রী হচ্ছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

এরাজ্যে নারী অপহরণ, পণের দাবিতে নারী নিগ্রহ ঘটেই চলেছে।

কিন্তু রাজ্যের সম্রাট নীরোর দল বেহালা বাজাচ্ছেন। ধন্য সিপিএম।

এখন গোষ্ঠীতে থাকলে "মালপানির অভাব হয় না।" উক্তি এক শ্রেণীর পার্টি কর্মীর। এ-রাজ্যে এমন নেতা-মন্ত্রী আছেন যার বাড়ি কুকুরটি ছাড়া তাঁর গোষ্ঠীর আত্মীয়-স্বজনের সকলেরই চাকরি ব্যবসা ফ্ল্যাট বৈভব হয়ে গেছে। যাঁরা আদর্শ ধরে খেটে যাচ্ছেন, তাঁরাই মরছেন। বিমানবাবু তো জানেন একজন নেতা মন্ত্রীকে ঠিকাদার বাড়ি গিফ্‌ট করেছেন বলে সংবাদপত্র লিখেছিল — সে সম্বন্ধে বিমান বাবুরা কী করেছেন? বিমানবাবু, মাছের মাথা থেকেই পচে যায়। "শিরে হৈল সর্পাঘাত তাগা বাঁধবি কোথা?" বিমানবাবু কিছুই করতে পারবেন না, শুধু লোক দেখানো হম্বিতম্বি। লোকে ভাববেন যাক এবারে পার্টি শুদ্ধ হচ্ছে। মোটেই তা'নয়। এটাও ভোটের জন্য স্ট্যান্ট গিমিক। আদতে সিপিএম-কে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলেই — সিপিএম-এর সম্বিৎ হয়তো ফিরতে পারে। তবে সে-কাজ করতে গেলে চাই বিরোধীদের সার্বিক ঐক্য। কংগ্রেস-তৃণমূল নেতাদের এই ঐক্য গড়ার মোটেই ইচ্ছা নেই।

স্কুলছুটদের স্কুলে ফেরাতে উদ্যোগ উত্তর দিনাজপুরে

মহাবীর প্রসাদ টোডি ।। উত্তর দিনাজপুর জেলায় উচ্চ প্রাথমিকের স্কুলছুট ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছে সর্বশিক্ষা মিশন। এইসব স্কুলছুটদের রবীন্দ্রমুক্ত বিদ্যালয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করতে

সর্বশিক্ষা মিশন চলতি আর্থিক বছরে দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বলে জানা গেছে। সর্বশিক্ষা মিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে যে, জেলার বিভিন্ন ব্লকে মোট ১৬৮টি রবীন্দ্রমুক্ত বিদ্যালয় রয়েছে। যার মধ্যে ১১৩টিতে আপাততকাজ শুরু করা গিয়েছে। বাকি ৫৫টি আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে পঠন-পাঠন শুরু করার চেষ্টা চলছে। এছাড়া মুক্ত বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন স্বাভাবিক রাখতে, ২৭২ জন শিক্ষামিত্রের মধ্যে ১৩৮ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। ১৩৪টি পদ এখনও ফাঁকা আছে বলে প্রকাশ।

মিশন জানিয়েছে যে, এই স্কুলগুলিতেই ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলছুট ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো হবে। বিভিন্ন ব্লকের গ্রামীণ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত স্কুলগুলি চলবে।

মিশন সূত্রে এও জানা গিয়েছে যে, জেলায় প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে সরকারিভাবে স্কুলছুটদের সংখ্যা প্রায় ৮৫ হাজার। বেসরকারি হিসাবে ওই সংখ্যা লক্ষাধিক। অভিযোগ, স্কুলছুটদের সংখ্যার বিচারে এই জেলা প্রথম স্থানে থাকলেও, তাদের জন্য বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থায় সিপিএম প্রভাবিত সর্বশিক্ষা মিশন এতদিন কোনও উদ্যোগই নেয়নি।

জেলা সর্বশিক্ষা মিশনের সদস্য তথা কংগ্রেস নেতা গোলাম রববানি বলেন যে, চরম অব্যবস্থার মধ্যে আমরা মিশনের দায়িত্ব নিয়েছি। সম্প্রতি দিল্লীর টিম জেলার প্রথাগত ও বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার চেহারা দেখে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে। স্কুলছুটদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনতে, রবীন্দ্রমুক্ত বিদ্যালয়ের জন্য দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, সিপিএম নেতাদের একটা বড় অংশ মিশনকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করায় সর্বনাশ হয়েছে।

এদিকে সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন সহ-সভাপতি অশোক সিং বলেন, সবটাই ওদের সস্তায় প্রচার পাওয়ার কৌশল। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রচুর কাজ হয়েছে।

এদিকে জেলার তথ্যাভিজ্ঞ মহল এ প্রশ্ন তুলেছে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে যদি সত্যিই প্রচুর কাজ হয়েই থাকে, তবে জেলায় স্কুলছুটদের সংখ্যা লক্ষাধিক হল কীভাবে? আর স্কুলছুটদের সংখ্যার বিচারে এই জেলা প্রথম স্থান অধিকার করল কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর সিপিএম-এর জেলা নেতাদের কাছে থেকে পাওয়া যায়নি।

সমৃদ্ধ সমাজের লক্ষ্যে

শিবরাজ সিং চৌহানের যুগান্তকারী পদক্ষেপ

বালিকা আত্মনির্ভর যোজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। শিল্পোন্নয়ণে গুজরাট যেমন ভারতের অন্য রাজ্যগুলির চাইতে অগ্রগণ্য, তেমনি মানবিক সম্পদ সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতে চলেছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। মধ্যপ্রদেশ সরকারের তথ্যও সংস্কৃতি বিভাগের সূত্র অনুযায়ী, কন্যা সন্তানকে শুধু রক্ষাই নয়, পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকে সুযোগ্য করে তুলতে, এক বৃহৎ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে শিবরাজ সিং চৌহান সরকার।

গত কয়েক বছর ধরেই খোদ কেন্দ্র সরকার বিজ্ঞাপন দিয়ে কন্যাভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে একদিকে যেমন আইনি অপরাধের কথা ঘোষণা করছে, অন্যদিকে তেমন লিঙ্গ বৈষম্যের করুণ পরিণতির আভাস দিয়ে কন্যা সন্তান রক্ষার জন্য জনসচেতনতা জাগানোর কাজ করে চলেছে। রাজ্য সরকারগুলিও এব্যাপারে নিজস্ব উদ্যোগে জনসচেতনতা এবং প্রচারের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। কিন্তু দু'বছর আগে থেকেই কন্যা সন্তান রক্ষার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছিলেন শিবরাজ সিং চৌহান। সম্প্রতি 'বালিকা আত্মনির্ভরতা যোজনা'-র কার্যকরী করতে একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন চৌহান সরকার।

সরকারি সূত্র মতে, বালিকাদের আত্মনির্ভরতার যোজনার অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের সমস্ত বালিকাদের সংস্কারমূলক শিক্ষার জন্য 'অঙ্গানুয়াড়ী চলো' নামে একটি যোজনা নেওয়া হয়েছে। এই যোজনার মাধ্যমে প্রতিটি বালিকার অক্ষরজ্ঞান, সংস্কার এবং আত্মবিশ্বাস জাগানোর কাজ করা হবে। এর জন্য গ্রামান্তর পর্যন্ত একটি করে কমিটিও গঠন করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এছাড়াও একশো শতাংশ বালিকার পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষার পথ প্রশস্ত করতে, সরকারিভাবে ব্লকস্তর থেকেই উপযুক্ত খোঁজ খবর এবং কার্যকারিতা শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরপর বালিকাদের গুণমান অনুসারে তাদের শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণের জন্য অভিভাবকদের উৎসাহ দেওয়া ও সঠিক দিশাদর্শনেরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সামাজিক স্তর থেকে যাতে নারীদের প্রতি কোনও দুর্লক্ষ্য বা অবহেলা না হয়, তার জন্য লিঙ্গ বৈষম্যের পরিণাম এবং শ্রদ্ধা-ভালবাসা জাগানোর জন্য প্রয়াস শুরু হয়েছে। দরিদ্র পরিবারগুলির কন্যা সন্তানদের জন্য সরকারিভাবে অর্থ সাহায্যের জন্য 'লাডলি লক্ষ্মী যোজনা' নামে এক বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট বয়সের আগে যাতে বিবাহ না হয়, তার জন্য আইন এবং সচেতনতা বৃদ্ধি — সব দিক থেকেই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এমনকী বিধবা বিবাহের মতো যোজনা বা বিধবাদের কর্ম সংস্থানের বা অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং হস্ত শিল্পের ক্ষেত্রে যুবতীদের এগিয়ে দেওয়ার যোজনাও নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের মতে, রাজ্যের উন্নয়ণের জন্য যেমন পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার, তেমনি সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়ণের জন্য মহিলাদের যথাযথ উন্নয়ণ দরকার। কেননা জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ যদি পিছিয়ে থাকে, তাহলে রাষ্ট্র কখনই এগোতে পারে না। এদিকে লক্ষ্য রেখে এক সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যেই এমন পদক্ষেপ। এর ফলে মানব সম্পদেরও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান। বিশেষজ্ঞদের মতে, নারীশক্তিকে মর্যাদা দিয়ে এবং এমন এক উদ্দেশ্য নিয়ে 'বালিকা আত্মনির্ভরতা' যোজনা গ্রহণ ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির চাইতে মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ সিং চৌহানের যুগান্তকারী পদক্ষেপ। শিল্পোন্নয়ণে নরেন্দ্র মোদী যেমন অন্যরাজ্যগুলির কাছে পথ প্রদর্শক, মানব সম্পদ উন্নয়ণ তথা নারী শক্তিকে স্বমর্যাদায় কার্যকরী করার এই পদক্ষেপও তেমনই এক যুগান্তকারী কর্ম বলে সমাজতত্ত্ববিদদের অভিমত।

“ কন্যা সন্তান রক্ষার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছিলেন শিবরাজ সিং চৌহান। সম্প্রতি 'বালিকা আত্মনির্ভরতা যোজনা'-র কার্যকরী করতে একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিয়েছে চৌহান সরকার।.....মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের মতে, রাজ্যের উন্নয়ণের জন্য যেমন পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার, তেমনি সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়ণের জন্য মহিলাদের যথাযথ উন্নয়ণ দরকার। ”

গত ২১ জানুয়ারি দিল্লীর দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গ-এ নবনির্মিত বি এম এসের ভবন উদ্বোধন করছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শনজী। সঙ্গে সহ সরকার্যবাহ মদনদাসজী। পাশে নতুন দত্তোপন্ত ভবন।

বিদ্যার্থী পরিষদের জাতীয় সম্মেলনে দাবি

সন্ত্রাস দমনে কঠোর পদক্ষেপ নিক রাষ্ট্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বর্তমান সন্ত্রাসবাদ আমাদের দেশকে কঠিন চ্যালেঞ্জের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই সকলকে এগিয়ে আসতে হবে সন্ত্রাসের এই ভয়াবহ সমস্যার মোকাবিলার জন্য। গত ২৪ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের জলগাঁওতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৫৪ তম জাতীয় সম্মেলনে একথা বলে দেশের ছাত্রশক্তিকে আহ্বান জানিয়েছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শ্রীমোদী সন্ত্রাসের সাথে সাথে বেশ কতকগুলো দিকে আলোকপাত করেন। তার কথায় গোটা দেশজুড়ে এখন গণতন্ত্রের সমূহ

বিষ্ণু দত্ত শর্মা

বিপদ;তাই জাতীয় নিরাপত্তাও ব্যাহত হচ্ছে। এসবের পিছনে অন্যতম কারণ জাতিভেদ ঘটিত সমস্যা এবং দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা নেতাদের ক্ষমতার অপব্যবহার। তিনি আরও বলেছেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে খুব কমই সৎ রাজনৈতিক নেতার উত্থান হয়েছে এবং উঁচুতলার নেতারাই করছেন ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি, যার অন্যতম ফল অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ। নাগরিক সুবিধা এবং সার্বিক উন্নয়ণের দিকটাতে আলোকপাত করতে গিয়ে শ্রীমোদী বলেন, যদি সমস্ত নেতারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে জল, রাস্তা,আলো এবং অর্থনৈতিক মন্দার মতো কাজ করেন তবে কোনও সমস্যাই থাকে না। উদাহরণ দিতে গিয়ে গুজরাটের ছবিও তিনি তুলে ধরেন।

চারিদিক থেকে ক্রমাগত সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের ফলে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা চরমভাবে বিপর্যস্ত। তাই এই দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারকে পদচ্যুত করতে সমস্ত দেশবাসীর কঠোর হাতে এগিয়ে আসা উচিত। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র ছাত্রশক্তি পাশে দাঁড়াতে তৈরি। বিদ্যার্থী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণুদত্ত শর্মা একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মাওবাদী পরিচালিত সন্ত্রাসবাদ তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে জাতীয় শান্তিতে আঘাত হানছে। এমতাবস্থায় সরকারের ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি কখনই করা উচিত নয়। সরকারের বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের উপর নিশ্ছিদ্র নজরদারী করা দরকার। শ্রীশর্মা শিক্ষাপদ্ধতির উপর নজর দিতেগিয়ে বলেন, 'আগে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল সকলের সেবা, কিন্তু আজ শিক্ষা পদ্ধতির ছবিটা হল — মেধাবী অথচ দরিদ্ররা তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারছেন না।' বস্তুত তারা দুজনেই (শ্রীশর্মা ও শ্রীমোদী) এই ভয়াবহ

ইন্দিরা দেবী

পরিস্থিতির মোকাবিলা করার পরামর্শ দেন বিদ্যার্থী পরিষদকে।

এই সম্মেলনে বিদ্যার্থী পরিষদের জাতীয় সভাপতি অধ্যাপক মিলিন্দ মারাঠে, রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক সুরেখা কিংগাওকার, সাধারণ সম্পাদক (রাজ্য) প্রকাশ বেলওয়াড়ে, অভিবাদন সমিতির সভাপতি ডা. অবিনাশ আচার্য্য এবং সম্পাদক ভরত অমলকর প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন এক মুক্ত মিলনে ২,৫০০-এরও বেশি কলেজ ছাত্র সমবেত হয়ে 'রাষ্ট্র রক্ষা যুব সংকল্প র‌্যালী'র আয়োজন করেছিল। শেষ দিন মণিপুরের ও ইন্দিরা দেবীকে বিদ্যার্থী পরিষদের বিখ্যাত 'অধ্যাপক যশবন্তরাও কেলকর যুব পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করা হয়। মহিলা উন্নয়ণ, প্রতিবন্ধীদের সাহায্যার্থে সেবা কাজে নজির সৃষ্টি করায় তাঁর এই পুরস্কার। শেষে ২৬টি রাজ্য থেকে আসা ১,৫০০ ছাত্র প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জানান ভরত অমলকর।

বিষাক্ত কালনাগ আই এস আই

কিরণ শঙ্কর মৈত্র

।। সাত ।।

২০০২ সালের প্রথম দিনই পাকিস্তানী কর্ম-কর্তারা ঘোষণা করলেন যে, প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ আই এস আই-কে আদেশ দিয়েছেন ইসলামী মৌলবাদী দলগুলি যারা কাশ্মীরে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম চালাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে, একথা ইসলামাবাদ থেকে 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস্-এর এক প্রতিবেদনে প্রকাশ। এখন থেকে সাহায্য করা হবে শুধু মূল কাশ্মীর ভূখন্ডস্থিত সংগঠনকে যারা 'জেহাদী' আন্দোলনের অংশ নয়। 'জেহাদী'দের সর্বাধিক কুখ্যাত প্রকাশ লাদেনের আল কায়েদা অনুগামীদের মধ্যে। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস এর ফলে পাকিস্তান-ভিত্তিক জৈস এ মহম্মদ এবং লস্কর-এ-তৈবার অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম অনেক কমে যাবে। ভারতীয় পার্লামেন্টে গত ১৩ ডিসেম্বরে জৈস এবং লস্করের আক্রমণ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেও, পাকিস্তান স্বীকার করে যে কাশ্মীরে গত তিন বছরে হিংসাত্মক কর্মের অন্তত ৭০ শতাংশ ঘটনার জন্য এই দুটি গোষ্ঠীই দায়ী।

পাক-কর্তৃপক্ষ মুশারফের প্ল্যান ব্যাখ্যা করে বলেন যে, কাশ্মীরে যে গোষ্ঠীটিকে পাকিস্তান সমর্থন করত, তাদের যেন অস্ত্র সাহায্য থেকে বিরত হয় আই এস আই-এর সংশ্লিষ্ট শাখা। পাকিস্তান শুধু সেইসব গোষ্ঠীকেই সমর্থন করবে, যাদের কাশ্মীর ভূমিতে ভিত্তি এবং কাশ্মীরীদেরই উপর নির্ভর করবে উগ্রবাদী কর্ম। উদাহরণ স্বরূপ হিজব-উল-মুজাহিদিনের কথা উল্লেখ করা হয়, যারা ১৯৮৯ সালের শুরু থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত কাশ্মীরে উগ্রবাদী কর্মে অগ্রণী। পরবর্তীকালে হিজব, লস্কর ও জৈস-এর কাছে গুরুত্ব হারায়।

ইসলামাবাদ থেকে হিজব নৈতিক ও রাজনৈতিক সাহায্য পাবে। কিন্তু মিলিটারি ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্র পাবে না এবং তাদের দল থেকে সব অকাশ্মীরী মুসলমানদের বার করে দিতে হবে — আরব ও চেচনিয়ার মুসলমানসহ। কাশ্মীরে বহু উগ্রবাদী বিদেশীদের সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যদের সংঘর্ষ হয়েছে। পাশ্চাত্য গোপন সূত্রগুলিও নিশ্চিত যে, অনেক সন্ত্রাসী আফগানিস্তানে আলকায়দা দ্বারা ট্রেনিং প্রাপ্ত। পাশ্চাত্য কূটনীতিকগণ মুশারফের সিদ্ধান্তকে সাহসী পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন — এই উপমহাদেশের উত্তেজনা প্রশমিত করার ব্যাপারে, ভারতীয় পার্লামেন্টে সশস্ত্র আক্রমণের পরে। কিন্তু তারা এও বলেন যে — আই এস আই-কে উগ্রপন্থী কার্যকলাপের ব্যাপারে নিবৃত্ত করা সহজ নয়। ডিপ্লোম্যাটরা জানেন — আই এস আই অন্তরালে কাজ করে এবং তাদের ব্যয়ের ব্যাপারে তারা অনিয়ন্ত্রিত। এটি অনেকদিন ধরে একটি দুর্জন-শঠ প্রতিষ্ঠান।

কিছুদিন আগে মুশারফ একজন নতুন আই এস আই প্রধান নিযুক্ত করলেও, তিনি জানেন — এদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ নয়। মুশারফের সাহায্যকারীরা বলেন — কাশ্মীরের হিংসাত্মক কর্মে লিপ্ত উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ বন্ধ করতে যাওয়ায় রাজনৈতিক ঝুঁকি আছে। কাজে বাধা পেলে পাক্ প্রেসিডেন্টের জীবন সংশয় হতে পারে। ২৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী ব্যাখ্যা করে বলেন — সাম্প্রতিককালে তার দেশ এমন একটি পথ অবলম্বন করেছে, যার ফলে ইসলামকে এমন এক স্তরে অবনয়ন করা হয়েছে যে, দুনিয়ার লোকেরা একে যুক্ত করেছে অশিক্ষা, পশ্চাৎগামীতা, অসহিষ্ণুতা, তমসাচ্ছন্নতা, আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গীর সঙ্গে এবং এখন পাকিস্তানের সামনে যে-পথ খোলা রয়েছে তা (র‍্যাডিক্যাল) আমূল পরিবর্তনের অথবা ধবংসের সম্মুখীন হওয়া।

শিলিগুড়িতে একটি বড়সড় ধরনের আই এস আই চক্র ধরা পড়ে জানুয়ারির (২০০২) প্রথমে। কলকাতা থেকে তৎকালীন রাজ্য গৃহমন্ত্রকের সচিব জানান "আমরা পশ্চিম বাংলায় এতো বড় ধরনের আই এস আই এজেন্ট আগে ধরতে পারিনি।" এই গুপ্তচরেরা ব্যস্ত ছিল উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত থেকে ওয়েস্টার্ন সীমান্তে সেনাবাহিনীর যাতায়াত সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহে। তাদের কাছে ছিল শিলিগুড়ির ভিতরের ও আশেপাশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাসহ, ৩৩ কোরের হেডকোয়ার্টার, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন, ইন্ডিয়ান অয়েল, তিস্তানদীর উপরে করোনেশন ব্রিজ-এর ম্যাপ ও ফোটোগ্রাফ। কাশ্মীর সীমান্তে সেনা বাহিনীর যাতায়াতের তালিকাও ছিল তাদের কাছে।

গুপ্তচরমন্ডলীর প্রধান মহম্মদ দিলসাদ (৪০)-কে নিযুক্ত করেছিল সিধা হায়দ্রাবাদ (পাকিস্তান) থেকে। অন্যান্যদের মধ্যে ছিল মহম্মদ আজাদ — ভারতীয় আর্মি সার্ভিস কোর ব্যাটালিয়ানের একজন আর্মি ক্লিনার, ব্যারাকপুরের মহম্মদ শাহাজাদ, মনীশ গোয়েল ও মহম্মদ সেলিম।

শিলিগুড়ির আদর্শনগর থেকে দিলশাদকে গ্রেপ্তার করা হয়, যখন সে টেলিফোনের বুথ থেকে টেলিফোন করতে যাচ্ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আই এস আই-পরিপোষকতায় মারাত্মক সন্ত্রাসবাদী হামলাটি ঘটল কয়েকদিন

ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে নামানো হয়েছে কান্দাহারে। (ফাইল চিত্র)

পরে, ২২ জানুয়ারি সকালের দিকে কলাকাতায়, আমেরিকার সেন্টারে, একেবারে চৌরঙ্গীর উপরে, জওহরলাল নেহেরু রোডে।

দুটি মোটর সাইকেলে, মুখোশ পরা চারজন লোক। আমেরিকার সেন্টারের সামনে, রাতের পুলিশ ডিউটির পরে সকালে অন্য পুলিশের কাছে ডিউটি বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাবার সময়ে। পুলিশের হাতে তখন শুধু লাঠি। আতঙ্কবাদীরা হাই ক্যালিবার অটোমেটিক রাইফেল থেকে ৫৫ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। পুলিশের তরফ থেকে একটিও গুলি চলেনি। তিনজন পুলিশ ঘটনাস্থলে মারা যান। দু'জন হাসপাতালে যাবার পথে। ১৩ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। আমেরিকান অ্যামব্যাসির ভাড়া করা গার্ড এবং একজন পথচারীও আহত হয়। চার মিনিটের মধ্যে নিজেদের অভিযান চালিয়ে আততায়ীরা চলে যায় অক্ষত দেহে, সুস্থ শরীরে।

সেদিনই একটি বাংলা সংবাদপত্রের অফিসে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি ফোন করে জানায় — 'হরকৎ-উল-জেহাদ-এ-ইসলামী'-এর 'আসিফ রেজা কম্যান্ডো ফোর্স' এই আক্রমণ চালিয়েছিল। দু'মাস আগে গুজরাট পুলিশ এক এনকাউন্টারে আসিফ রেজাকে হত্যা করার বদলা নেবার জন্যে।

গত ২০০১ সালে রেজাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দিল্লীতে। কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী পার্থ রায় বর্মনকে অপহরণের অভিযোগে। রেজাকে গুজরাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ভাস্কর পারেখকে অপহরণের অনুসন্ধানের জন্যে। পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে পুলিশের গুলিতে সে নিহত হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন গৃহমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী বলেন — আমেরিকান সেন্টারের আক্রমণের দায়িত্ব স্বীকার করেছে একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী যাদের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে পাকিস্তানের আই এস আই-এর। সংবাদসূত্র সম্বন্ধে বিশদ করে বলতে গিয়ে গৃহমন্ত্রক পরে জানায় — "দুবাই স্থিত টেররিস্ট মোতিউল"টির নেতা ফরহান মালিক, যার কলকাতায় রয়েছে কর্মজাল, আমেরিকান সেন্টার আক্রমণের পেছনে। ফরহানের রয়েছে পাকিস্তানী পাশপোর্ট এবং প্রায়ই সে পাকিস্তানে যায়।

ফরহান ওরফে আফতাব আনসারি কলকাতা সি আই ডি-র এস পি রাজীব কুমারকে ফোন করে বলেছিল — আমি দুবাই থেকে বলছি। আমেরিকান সেন্টারে হামলা আমরাই করেছি। রাজীব কুমার ফরহানকে একটি কেসে আগে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। তাই তিনি ফরহানের গলার আওয়াজ ভালোভাবে চেনেন। তিনি নিশ্চিত — এটি ফরহানের গলার আওয়াজ। সে ধমকি দিয়েছে — তার গ্রুপ এইরকম আক্রমণ দিল্লী ও গুজরাতে আরও করবে।

এই ধমকি কিন্তু শুধু ধুমকিই ছিল না। যথাস্থানে বর্ণিত পরবর্তী ঘটনায় তার প্রমাণ। সূত্রানুযায়ী আফতাব আনসারি (ফরহান) মূলত বাংলাদেশ থেকে এসে ২০০০ সালে কলকাতায় থাকতে শুরু করে। ভারতে সন্ত্রাসমূলক কর্মবিধিতে তাকে ট্রেনিং দেয় আই এস আই। পরে তাকে সাহায্য করে দুবাই যেতে একটি পাকিস্তানী পাসপোর্ট দিয়ে।

২০০১ সালের জুলাই মাসে সে কলকাতার খাদিম জুতোর মালিক পার্থপ্রতিম রায় বর্মনকে অপহরণ করে কোটি টাকা মুক্তিমূল্য পেয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। আফতাব মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল গুজরাটের মণিকার বি পারিখের ছেলে ভাস্কর পারিখের অপহরণে (ডিসেম্বর, ২০০০)। তিন কোটি টাকার

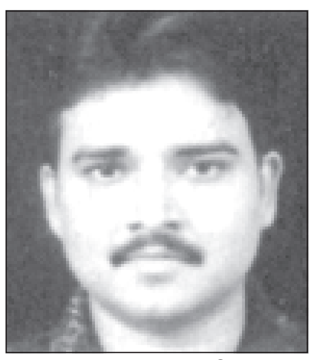

আফতাব আনসারি

বিনিময়ে যেমন ভাস্করকে সে ছেড়ে দেয়, তেমনি ফিল্মস্টার গোবিন্দার আত্মীয় জয়ন্তী লালকে (মার্চ, ২০০০) অপহরণের পরে সাত লাখ টাকার মুক্তিপণে ছেড়ে দেয়। এইসব অপহরণের কাজে আফতাবকে সাহায্য করেছিল আসিফ রেজা খান।

দিল্লী পুলিশ কমিশনার অজয় রাজ শর্মার উপরে হামলা করতে গিয়েছিল আসিফ (সেপ্টেম্বর ২০০১)। ধরা পড়ার পরে সে পার্থপ্রতিম রায় বর্মনের অপহরণে তার অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করে। আফতাব তার কাছে করাচি থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছিল, পুলিশ গুজরাট ও হরিয়ানায় তা বাজেয়াপ্ত করে। আসিফের জন্ম এবং বড় হওয়া কলকাতায়। তাই কলকাতাকে সে খুব ভালো করেই জানে। তার ভাইকেও পুলিশ পরে গ্রেপ্তার করেছিল।

গৃহমন্ত্রকের সূত্রে জানা যায় — আই এস আই ফরহানকে ইসলামাবাদে (আগস্ট, ২০০১) নিয়ে হরকৎ-উল-জেহাদ-এ-ইসলামির ওমর শেখের তত্ত্বাবধানে রেখেছিল। ভারতীয় বিমান অপহরণে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে কান্দাহারে ওমন শেখকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ফরহান (আফতাব আনসারি) হরকৎ-উল-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে কুকর্মে ব্যস্ত ছিল। ঢাকায় ছিল তাদের দপ্তর এবং চিটাগং হিলস্-এ ট্রেনিং ক্যাম্প। আফতাব তার সাঙ্গপাঙ্গের সঙ্গে সন্ত্রাসমূলক কাজের জন্যে যে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করত তার মূল্য মুক্তিপণের পাওয়া টাকায় দিয়ে দিত। তার বিশ্বস্ত সহকর্মী আসিফ রেজা খান গুজরাটের পুলিশের হাতে মারা গেলে (৭ ডিসেম্বর, ২০০১) আফতাব তার অভাব বোধ করতে থাকে। আমেরিকান সেন্টারে হামলা আসিফের মৃত্যুর বদলা নিতে।

জনা ষাটেক লোককে কলকাতা পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আটক করেছিল। নানা জায়গা থেকে পুলিশ তুলে এনেছিলে ৫৫ জন, সি আই ডি ধরেছিল দু'জন বাংলাদেশীকে এবং মাদ্রাসার তিনজন শিক্ষককে। ধৃতদের মধ্যে ছিল আসিফ রেজা খানের ভাই আলতাফ রেজা খান। উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরের বিথানি জামিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার তিনজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ — তারা সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দিয়েছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে বসিরহাট থেকে দু'জন বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আফতাব আনসারির জীবন কাহিনী বৈচিত্র্যপূর্ণ। একসময়ে সে বারাণসীর কোলাপুরায় থাকত। তার অপরাধী জীবনের শুরু উত্তরপ্রদেশে দিনেশ ঠাকুরের দল থেকে। উল্লেখ্য, সে কলেজে আইন ও জার্নালিজম পড়ত। ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে বিহারের নালন্দা থেকে সে একটি পাসপোর্ট বানায়, ফরহান মালিকের নামে। ২০০১ সালে সে রাওয়ালপিন্ডিতে যায়।

একটি পাকিস্তানী মেয়েকে সে বিয়ে করে। তার ভাই তাহির কাশ্মীরে একজন সক্রিয় উগ্রপন্থী ২০০০ সালের প্রথমে সে আই এস আই-এর সংস্পর্শে এসে তাদের কাজ করতে শুরু করে। ভারত বিরোধী উপযুক্ত যুবকদের কলকাতা এবং মুম্বাই থেকে সে সন্ত্রাসবাদী কাজে ট্রেনিং দেবার জন্যে পাকিস্তানের বাহায়াল পুরের লস্কর-এ-তৈবার ক্যাম্পে পাঠাত। 'সফির মহম্মদ রানা' নাম দিয়ে তাকে একটি পাকিস্তানী পাসপোর্ট দেওয়া হয় (নং জে ৮৭২১৪২) যা ২০০৬ সাল পর্যন্ত বৈধ। আরও অনেক দেশের পাসপোর্ট আছে তার, আলাদা আলাদা নামে। খাদিম শু'জ-এর মালিক পার্থপ্রতিম রায় বর্মনকে অপহরণ করার পরে ৩.৭৫ কোটির মুক্তিপণে ছেড়ে দিয়ে আফতাব 'বিখ্যাত' হয়ে যায়। হাওয়ালা-মাধ্যমে সে এই টাকটা পেয়েছিল। ২২ জানুয়ারি কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে হামলা তারই মস্তিষ্ক প্রসূত। কলকাতায় সে ধরা পড়েনি। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী আফতাব আমেরিকান সেন্টারে হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে দুবাই থেকে সে কলকাতার একটি বাংলা সংবাদপত্রে ফোন করে। এটিই তার কাল হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য জানান— আই এস আই এজেন্টরা অনেক সময় বাংলাদেশ থেকে তাদের কাজ করে। আমরা এমন আটজন বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করেছি। একটি প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, — অনেক জাতীয় বিরোধীরা মাদ্রাসা থেকে কাজকর্ম করে, এইসব বন্ধ করতে হবে।

হাসিনার দ্বিতীয়বার ক্ষমতা লাভ ভারতের পক্ষে কতটা সুখকর

উদয়ন নাম্বুদ্রি।। ১৯৮৪-র নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভের পর রাজীব গান্ধী বলেছিলেন, 'জনসাধারণের প্রত্যাশাগুলো বড় ভয়ঙ্কর'। সম্প্রতি বাংলাদেশের মসনদে আওয়ামী লীগ তথা শেখ হাসিনা-র পুণর্নির্বাচনের পর হয়তো মুজিব-তনয়া কিছুটা সেরকম চিন্তাই করে চলেছেন। বস্তুত এই নির্বাচনে ভোটের মার্জিন নেহরু সময়কালের দিল্লীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশীয় অরাজকতা অবশ্য কারও অজানা নয়। হিরন্ময় কার্লেকার তার বইতে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং তালিবানের ভয়ঙ্কর মধুচন্দ্রিমা'র ওপর আলোকপাত করেছেন, (Bangladesh : the next Afghanistan, New Delhi, 2005)। তার দেখানো এই ওভার ক্রাউডেডহতদরিদ্র জাতির ছবি দেখে তাবড় তাবড়বুদ্ধি জীবীদের চক্ষুছানাবড়া হয়ে গেছে। আপাতত বাংলাদেশ তার আশা ভরসা সবকিছু সঁপে দিয়েছে এই প্রবীণার কাছে, যে কিনা বাংলাদেশের ইসলাম মুক্তির প্রতীক। দেখা যাক তাঁর হাত দিয়ে কী হয়?

হাসিনার আরও কিছু সমস্যা আছে, যেমন তাঁর ব্যাপক জয়লাভের পরে ভারতের আশায় বুকবাঁধা! ভারতের প্রায় সমস্ত বিদেশনীতিজ্ঞই মনে করছেন হাসিনা বাংলাদেশের শাসনে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সমস্যার বেশ কিছুটা সমাধান হয়ে গেল। যদিও '৯৬ থেকে ২০০১ — হাসিনার এই শাসনকালে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জঙ্গি কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্য ভাবে দমন করা হয়েছে, এরকম নমুনা প্রায় নেই বললেই চলে। একই সঙ্গে কেন্দ্রের সি আই আই জাতীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে হাসিনার হওয়া গ্যাস চুক্তি (Gas Collaboration), বিভিন্ন স্বস্তিকর 'সাংস্কৃতিক চুক্তি' এবং উত্তর-পূর্বে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রবেশের পথ চালু রাখার যে বোঝাপড়া হয়েছিল তা নিয়ে একবার সমীক্ষা হওয়া উচিত।

যেমনটা কাঞ্চন লক্ষণ বলেছেন, ইন্দো-বাংলা সম্পর্কের জায়গাটা নাকি '৯০ এর পরবর্তী সময়ে আশা ও হতাশায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। ১৯৯৬-এর ডিসেম্বরে হওয়া বাংলাদেশের সঙ্গে জলবন্টন চুক্তিই হল ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশের সুযোগ সন্ধানের শুরু। অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে রোদ, জল ও গ্রহ-নক্ষত্রের কাছ থেকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো যা পাচ্ছে ভারতেরও তাই পাওয়া উচিত। আঁখেরে তা কোনওভাবেই হয়নি। এমনকী পোখরান বিস্ফোরণের মতো ঘটনাও প্রতিবেশী দেশগুলোর অবিরাম সাহায্যের নামে প্রতারণাকে মেটাতে পারছে না।

এই নাটকে হাসিনা সক্রিয় ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিন দশকের জট পাকানো গঙ্গা জলবন্টন সমস্যার সমাধান অনেকটাই তার পক্ষে গেছিল। তার সঙ্গে বোনাস হল একগুচ্ছ ব্যবসায়িক সুবিধা লাভ। তা সত্ত্বেও, তাঁর কাছ থেকে পাওয়া প্রতিদান খুব একটা নেই! বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি দেখিয়েছেন তাঁর বাবা প্রয়াত 'বঙ্গবন্ধু'র ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতা। গৌরবের সময় যদিও কোনও প্রবীণার পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা শোভা পায় না, কিন্তু কোনও মতেই অনুপ চেঠিয়া'র ঘটনা ভোলা যায় না। চেটিয়া, উলফার অন্যতম সৃষ্টিকারী দলনেতা। চেটিয়া অবাধে খালেদা জিয়া'র দেওয়া আরণ্যক কাজে লাগিয়েছে হাসিনার শাসনকালেই।

সাতানববই-এর প্রথম দিকে পুলিশবাহিনী প্রধানমন্ত্রীর নিছক মুখের কথাকে গুরুত্ব দিয়ে তল্লাশি চালিয়ে চেটিয়া'র নিরাপদ ডেরা থেকে তাকে আটক করে। হাসিনার উচিত ছিল তার প্রতিশ্রুতি মতো নিরাপত্তার পরবর্তী ধাপে চেটিয়াকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া। তা না করে বরং তার নামে গোটাকতক ছোট ছোট কেস দিয়ে তার পুরনো কাজ কর্ম যথাযথ ভাবে চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পরোক্ষে সহায়তা করেন। ঘটনাচক্রে বাংলাদেশের একটি কোর্টেই তার বিচার হয়, এবং উল্লেখযোগ্যভাবে আদালতের রায় কিছু মাত্র কার্যকর হয়েছে। চেটিয়া'র রিলিজ (২০০৫)-এর সময় অবশ্য খালেদা শাসনে ফিরে এসেছেন।

মুম্বাই আক্রমণের পর দিল্লী সমস্ত বিষয়গুলোকেই দেখছে — উত্তর-পূর্বাঞ্চল সমস্যা, হুজি প্রভৃতি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম গত ১৬ ডিসেম্বর লোকসভায় বলেন 'একটা বার্তা অবশ্যই বাংলাদেশের কাছে পৌঁছে যাওয়া দরকার যে, তারা তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতিগুলোর প্রতি বদ্ধ পরিকর'। তিনি তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন তার মন্ত্রকের কাছে বাংলাদেশের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে উগ্রপন্থা মাথাচাড়া দেওয়ার তথ্য আছে। হাসিনার মসনদে বসার পর এটাই তার প্রথম কষ্টিপাথর পরীক্ষা বলে ধরে নেওয়া যায়। তিনি প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি পর্ব অবশ্য সেরে ফেলেছেন এই বলে যে, বাংলাদেশের মাটি কোনও জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। হাসিনা আরও আহ্বান জানিয়েছেন, জঙ্গি দমনের জন্য একটি যৌথ টাস্ক ফোর্স গঠন করার। সন্ত্রাসবাদকে কড়া হাতে দমন এবং উন্নয়ণের অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই প্রথম কাজ হবে। প্রস্তাবিত টাস্ক ফোর্স অবশ্য দুই বন্ধু দেশের কাদা ছোঁড়াছুড়ি (সন্ত্রাসবাদ নিয়ে) মেটাতে পারে, এরকমটাই মন্তব্য করেছেন ৬১ বছরের প্রবীণা বাংলাদেশের নির্বাচিতা প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সে অস্ত্রের ধার কমে গেছে। হাসিনার প্রথম মন্তব্যটার সবাই ভুক্তভোগী। একটা প্রস্তাব হিসেবে অবশ্য সেটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া। কারণ এই নমুনা আগেও পাওয়া গেছে ২০০২-এর সার্ক সম্মেলনে মুশারফের গল্পে!

আমাদের আরও একটা বিষয় ভুললে চলবে না 'মানকাছাড় ঘটনা' যখন হয়েছিল তখন ঢাকাতে ক্ষমতায় ছিলেন হাসিনা-ই। ২০০১-এর এপ্রিলে সীমান্তে প্রহরারতবি এস এফের এক অফিসারকে নৃশংসভাবে হত্যা করে বাংলাদেশের নিরাপত্তা রক্ষীরা (বি ডি আর)। ভারতের পক্ষ থেকে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেও, বি ডি আর প্রধান তার চাকরি বহাল তবিয়তে বাঁচিয়ে রাখে। এভাবেই 'মুজিব তনয়া'র বাংলাদেশের সাথে চলা দিল্লীর বিদেশনীতিতে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। ভারত বুঝতে পারে ৯২ পরবর্তী বাংলাদেশের সাথে নেওয়া দ্বিপাক্ষিক পদক্ষেপগুলো এককথায় বড় ভুল।

তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওই বছর অক্টোবরে হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত হয়। ভারতের কাছে সেই খবর একটা আঘাত হিসেবে এল। মনে রাখতে হবে, এই ঘটনার চার সপ্তাহ পেরোয়নি যখন ৯/১১ ঘটে যায়। এবং তৎকালীন ভারত দুটি ইসলাম উগ্রপন্থা চালিত রাষ্ট্রের চাপে চিড়েচ্যাপটা। ভয়াবহতা আরও খারাপ আকার ধারণ করেছিল এই ধারণায়, ভারতের হাসিনাতোষণ এবং খালেদা বিরোধিতা, নতুন ঢাকা গঠনে ভারতের খুব একটা সাহায্যের হাত নেই।

যাই হোক, ২০০৯-এর হাসিনা '৯৬-এর হাসিনা'র সাথে হয়ত নাও মিলতে পারে, যেমনটা জয়িতা ভট্টাচার্য বলেছেন — আমাদের দেখা এখনকার বাংলাদেশের ধার্মিক চরমপন্থা, তথা কার্লেকরের দেখানো তালিবানপন্থার বিরুদ্ধে এক শাসনব্যবস্থা। আমাদের চোখে একজন রাজনীতিক হিসাবে হাসিনার এখনকার পদক্ষেপ মনে হচ্ছে না মৌলবাদীদের দ্বিতীয়বার ভাবার সময় দেবে। তিনি স্বয়ং ২০০৪ সালের জঙ্গি হামলার একজন শিকার এবং তাই সাধারণের সহানুভূতি পাওয়ার জায়গাটাও থেকে যাচ্ছে। তাঁর ক্ষেত্রে অবশ্য এই সদিচ্ছা রাজনৈতিকভাবে চতুর নাও হতে পারে।

এই চিত্রপটে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ওবামা-আমেরিকা! দশকের পর দশক ধরে, আমেরিকার চোখে বাংলাদেশ একটা তুচ্ছ দেশ, যে দেশে কিসিংগার-এর চোখে ইসলামের চরমপন্থা ধরা পড়ে। তাও আবার ৯/১১ পরবর্তী সময়কালে। ঘটনাচক্রে যখন সময় আসে, একজন মার্কিন রাষ্ট্রপতির অনুশীলনমূলক তৎপরতা বাড়ে সন্ত্রাসবাদের দমনমূলক ব্যবস্থায়। তখন আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের মতো ভূখণ্ড পাকিস্তানের পরিকল্পনার একটা বড় অংশ, আই এস আই-এর পক্ষে একটা সুখকর আশ্রয়স্থল, এক বড় অশুভযজ্ঞের ঘাঁটি। একশোবার বলা যায়, ওবামার ওপর ভরসা করাও একটা ভয়ঙ্কর প্রত্যাশা, যেখানে তিনি প্রচার শেষে আমেরিকার এক আমূল

(এরপর ১২ পাতায়)

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন অনেক ঢাক-ঢোল পেটানো হচ্ছে

তারক সাহা।। পুরোন বছর পেরিয়ে নতুন বছরকে যখন স্বাগত জানাতে ব্যস্ত, সেই মূহূর্তে এই উপমহাদেশের প্রতিবেশী এক রাষ্ট্র বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরলো অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়েই। মনে করা হচ্ছে জঙ্গি রাজের আপাত সমাপ্তি ঘটলেও এখন-ই তেমন কোনও লক্ষণ নেই যাতে করে বলা যায় জঙ্গিরা গুঁটি-সুঁটি মেরে পাততাড়ি গোটালো। সময়ের নিরিখেই এই নির্বাচনের এবং তৎপরবর্তী ফলাফলের পরিণামের বিষয়টা সামনে আসবে।

বহু প্রতীক্ষিত বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের পাট চুকেছে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর। অথচ এই নির্বাচন হবার কথা ছিল প্রায় এক বছর আগে— ২২ জানুয়ারি ২০০৮-এ। কিন্তু এই নবম সংসদীয় নির্বাচন বিলম্বে হলেও প্রায় শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াতেই সংগঠিত হল, যা আগে কোনওদিন ঘটেনি। তবে বিশ্বের সবচেয়ে গরীব রাষ্ট্রটিতে যেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন ঘটলো তার পুরো কর্তৃত্বটাই প্রাপ্য নির্বাচন কমিশনের। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের মতোই এখানেও নির্বাচন কমিশন বেশ কড়া হাতে বাতিল করেছে ভুয়ো ভোটারদের তালিকা। এক সময়ে বি এন পি সরকারের সময়ে ভুয়ো ভোটার সমেত যে তালিকা ছিল তাতে ভোটার সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ। নির্বাচন কমিশন কাটছাঁট করে সেই সংখ্যা নামিয়ে এনেছে ৮০ লক্ষে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ব্যক্তিগত আয় এবং তাদের সম্পত্তির হিসেব এই প্রথম সেখানে চাওয়া হল। আড়াই হাজার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে কমিশন মাত্র দেড় হাজার প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশ নিতে অনুমতি দেয়।

যদিও অনুমান ছিল এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-ই ক্ষমতা দখল করবে। কিন্তু এমন বিজয় স্বয়ং লীগ প্রধান হাসিনাও কল্পনায় ভাবতে পারেননি। নির্বাচনের ফলাফলে ২৯৯টি সংসদীয় আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও তার অনুগামীদলগুলি পেয়েছে ২৬৩টি, জাতীয় দল ও তার সমর্থকরা পেয়েছে মাত্র ৩১টি আসন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের মতো বাংলাদেশেও রাজনীতির রমরমা।

কিন্তু হাসিনার পার্টির এমন জয়ের কারণ কী? বলা হচ্ছে বাংলাদেশীরা ওই দেশে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যে অরাজকতা চলছে তা থেকে মুক্তি চায়। একাধারে যেমন বি এন পি-র ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, ভারত বিদ্বেষী জঙ্গিদের প্রশ্রয় দেওয়া, জিনিসপত্রের আকাশমুখী মূল্য, অসহনীয় বেকার এবং সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতেই যেন এই নির্বাচনের এমন কালজয়ী ফল। নির্বাচনের আগে হাসিনার দল প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তাঁর দল দেশকে এক পরিচ্ছন্ন প্রশাসন দেবে, যেখানে থাকবে না দুর্নীতি। প্রতিশ্রুতি আছে সুশাসনের, ভাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, উন্নত শিক্ষারমান, রুদ্ধ করা হবে আকাশমুখী মূল্যবৃদ্ধি, মানুষকে দেওয়া হবে আরও বিদ্যুৎ — এমনই অঢেল প্রতিশ্রুতি যার মধ্যে রয়েছে জঙ্গিহীন বাংলাদেশ।

অন্যদিকে বি এন পি- প্রতিশ্রুতি ছিল অনেক নেতিবাচক। বি এন পি নেত্রীর প্রতিশ্রুতি ছিল "ইসলাম বাঁচাও" স্লোগান। এমন স্লোগান আগে অনেক শুনেছে বাংলাদেশীরা। মুখে যখন অন্ন থাকে না, পরিধানে যখন কাপড় থাকে না, তখন "ইসলাম বাঁচাও" স্লোগান মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এমন অকাট্য সত্য বাংলাদেশসহ আমাদের অনুজ প্রতিবেশী রাষ্ট্রকেও বুঝতে হবে যে, শুধুমাত্র ধর্মের জিগির তুলে, মানুষের নিত্য সমস্যাগুলির সমাধান না করে, বেশিদিন যে চলতে পারে না তা বাংলাদেশ সারা দুনিয়াকে দেখিয়েছে।

কিন্তু সংশয় তবুও থেকে যায়। হাসিনা ক্ষমতা লাভ করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্য দূর করতে তিনি রুখবেন। সংশয় এখানেই যে, এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশের সবচেয়ে কট্টর মৌলবাদী দল জামাত-ই-ইসলাম প্রায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। তবে একেবারে মুছে যায়নি জামাতী। ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হল তখন ভাবা হয়েছিল যে, বাংলাদেশ বন্ধু রাষ্ট্রের মতো ব্যবহার

(এরপর ১২ পাতায়)

মেদিনীপুর শহরে নারকীয় ঘটনা

গত ৮।১১।০৮-এ ঘটনার কিছুদিন আগের ঘটে যাওয়া সূত্র অনুযায়ী একটি হিন্দু ছাত্রীকে একটি মুসলমান ছেলে নিয়মিতভাবে টিস করত। ফলস্বরূপ ওই মুসলমান ছেলেটিকে 'বজরং' নামে একটি ক্লাবের কয়েকজন ছেলে বেশ মারধোর করে — এই ঘটনার ফলে মুসলমানদের বজরং ক্লাবের প্রতি বেশ রাগ হয়। মহরমের তিনদিন আগে বজরং ক্লাবের তৈরি হনুমানজীর মন্দিরের সামনে দিয়ে তাদের আখড়া যাওয়ার সময় ওই মন্দিরের ভেতর আগুনের ফুলকি ফেলে দেয়। ফলে সাময়িকভাবে কিছু গন্ডগোল চলে এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং পরে ওই দিনই ক্লাবের সদস্যগণ এবং পাশাপাশি অনেকেই প্রায় ৫০০ জনের স্বাক্ষরসহ একটি আবেদন থানায় জমা দেয়। আবেদনের বিষয় ছিল মহরমের দিন কোনও তাজিয়া ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি যে, ওই ক্লাব কমিটির উচ্চপদে সি পি এম পার্টির জেলা সম্পাদক তথা আরও কয়েকজন নেতৃত্বে থাকায়, ভোট ব্যাঙ্ক-এর স্বার্থে থানায় বসে একটি চুক্তি তৈরি হয় পূর্বের মতো মুসলমানেরা ওই পথেই তাজিয়া নিয়ে যাবে। যদিও এই সিদ্ধান্ত বজরং ক্লাবের অধিকাংশ সদস্যদের মনঃপুত হয়নি। বিতর্কিত ওই বিষয়ে মহরমের দিন যথেষ্ট পুলিশ বা পার্টির সেই ধরনের কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না। মহরমের দিন সকাল ১০টার সময় পরপর দু'টি তাজিয়া নিরাপদে পাশ করে গেলেও তৃতীয় আখড়া পেরোনোর সময় মুসলমানদের মধ্যে বেশ উন্মত্ততা থাকায় ক্লাবের ছেলেরা বাধা দেয় এবং উভয়ের মধ্যে ভীষণ সঙ্ঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ক্লাবের সদস্যরা ছাড়াও পাশাপাশি সমস্ত হিন্দুরাও প্রতিরোধ করে। মুসলমানদের প্রথমটা লড়াই করলেও পরে পিছু হটতে থাকে। যথেষ্ট পুলিশ না থাকায় পুলিশ নীরব দর্শক ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। এই খবর মুসলমানেরা অতি দ্রুততার সঙ্গে শহরের বিভিন্ন মহল্লায় অতিরঞ্জিত করে ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে শহরের বিভিন্ন মূল রাস্তার ওপর, দোকান ঘরের উপর বেপরোয়াভাবে ওদের তান্ডব চলতে থাকে। ওই রাস্তাগুলো দিয়ে বাস, মোটর সাইকেল, পথচলতি মানুষেরা প্রাণ নিয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। গোটা শহর মুসলমান দুষ্কৃতিকারীদের হাতে চলে যায়। শহরের বাইরে থেকেও মুসলমানেরা শহরের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করে — মহরমের মূল অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। শহরে যখন আগুন জ্বলছে সেই সময় ডি এম, এস পি, এ ডি এম, ই এফ আর, র‍্যাফ ইত্যাদি ভালো সংখ্যায় পথে নামায়, ধীরে ধীরে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে বেলা ১টার সময় ডি এম এবং এস পি ফোন করে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব, মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি এমনকি আর এস এস-এর নেতৃত্বকেও আলোচনায় ডাকেন। ডি এম এর কার্যালয়ে ওই বৈঠক হয়। সেখানে সকলে প্রশাসনের ত্রুটির কথা বলেন। এবং প্রশাসনের দুর্বলতার জন্যই এই ঘটনা বলে অভিযোগ করেন। ডি এম, এস পি, সকলের সহযোগিতা চান। বিকেল ৪টার সময় একটি শান্তি মিছিলের ডাক দেন এবং দলমত নির্বিশেষে তা হয়। কিন্তু শহরের মুসলিম মহল্লা যেখানে একটি নাম করা জোড়া মসজিদ আছে সেখানে সমর্থক তথা মুসলিম সংগঠনগুলি মিছিল আটকে দেয়। অনেক অনুনয় বিনয় করার পরও মিছিলটিকে যেতে দেওয়া হয় না। ফলে মিছিল ঘুরে যায়। পরবর্তী সময়ে পুলিশ বজরং ক্লাবের কিছু সদস্য ও ওখানকার স্থানীয় কিছু যুবককে গ্রেপ্তার করে। প্রশাসনের তরফ থেকে মুসলমানেরা যাতে ওদের মহরমের অনুষ্ঠান পুনরায় করতে পারে তার জন্য বারবার অনুরোধ জানানো হয়।

এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর শহরের হিন্দুদের মধ্যে একটা ভীতি তৈরি হয়েছে। সাথে সাথে একটা চেতনাও তৈরি হয়েছে।

তবে ওই বজরং ক্লাবের সঙ্গে আমাদের কয়েকজন স্বয়ংসেবক যুক্ত আছে। তাদের মধ্যে একজন যথেষ্ট পরিণত এবং দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন। অভিজ্ঞ স্বয়ংসেবকের বক্তব্য অনুযায়ী, এই ঘটনার জন্য পুরো দায়িত্ব প্রশাসন ও সি পি এম পার্টির কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্তের জন্যই ঘটেছে। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটাকে হিন্দু ও মুসলমানদের বলা যাবে না। আমি প্রশাসনকেই বারবার দায়ী করব। আপাতত ওই দিনের ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

স্বপন ঘোষ, শরৎপল্লী, মেদিনীপুর, (বিভাগ কার্যবাহ, আর এস এস)

দু'রকম আইন !

সংবাদে প্রকাশ ২৬।১১ হামলার অনেক আগেই পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীরা টাটা কোম্পানীর মালিকানাধীন তাজ হোটেলে 'কর্মচারী হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিল। তদন্ত হওয়া উচিৎ কাদের সুপারিশে এই নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। কে বা কোন কর্মকর্তা পরিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খ না জেনেই তাদেরকে নিযুক্ত করেছিল? তাছাড়া যে হোটেলে দেশী-বিদেশী হাই-প্রোফাইল অতিথিরা নিয়মিত যাতায়াত করেন, রাত্রিবাস করেন, সেখানে নিরাপত্তার বেড়াজাল ভেদ করে পাকিস্তানী উগ্রপন্থীরা কীভাবে হোটেলের মধ্যেই অস্ত্রাগার তৈরি করেছিল? তাহলে সফিকুলকে আশ্রয় দিয়ে যে অপরাধ মালদার হাজি আখতার হুসেন করেছে, ফলে গ্রেপ্তারও হয়েছে;সেই একই অপরাধ কি টাটা-কর্তারাও করেননি?শিল্পপতি হওয়ার কারণে সেই অপরাধ স্খলন হয়ে গেল! তাহলে একদেশে একই অপরাধে রাষ্ট্রের চোখে দু'জনের ক্ষেত্রে ব্যবহার কী দু'রকম হয়ে গেল না!

এইসব কথা গুরুত্ব দিয়ে তদন্তের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। তাহলে ভবিষ্যতে সাধারণ নিরীহ নির্দোষ জনগণ সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।

দেবাশিস ব্যানার্জী, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

নরেন্দ্র মোদী

ভারতবর্ষের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আজ জ্বলে উঠেছে। সেই তারকার আভায় ভারতের গণতান্ত্রিক আভরণ হয়ে গেছে আরও সমুজ্জ্বল। দেশের সীমা পেরিয়ে জননীর সেই সুসন্তানটির নাম ছড়িয়ে গেছে গণতান্ত্রিক বিশ্বের প্রতিটি কোণে। কর্মদীপ্ত, দেশহিতব্রতী এই ভারত সন্তান — স্বনামধন্য নরেন্দ্র মোদী।

রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার একটি পথ ও উপায় গণতন্ত্র। কিন্তু জনগণের শাসনের এই রূপটি ভারতের কিছু কিছু রাজ্যে ব্যক্তি ও দলের কুশাসন, পক্ষপাত ও স্বৈরতন্ত্র দুষ্ট। ফলে মানুষের কল্যাণের বাণী সেখানে স্তব্ধ, বিক্ষিপ্ত। আর এখানেই নরেন্দ্র মোদীর সাফল্য। গণতন্ত্র ও আর্থিক উন্নয়ন যে সমার্থক, মাত্র কয়েকটি বছরে তিনি সমগ্র দেশবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। দেশভক্ত, গণতান্ত্রিক ভাবনা-চিন্তার গবেষকদের কাছে নরেন্দ্র মোদী আজ আদর্শ।

সম্প্রতি আমেদাবাদে দেশের সব শিল্পপতিকে 'ভাইব্রেন্ট গুজরাটের' নামে জড়ো করে আগামী দিনে গুজরাটের উন্নয়ণের এক বাস্তব মানচিত্র দেশবাসীর সামনে রেখেছেন। শিল্পপতিরা একবাক্যে উদ্যোগী কর্মবীর নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আর এখানেই হয়েছে বিপত্তি। মোদীর এই জয়গান কিছু কিছু রাজনীতির ব্যবসায়ীদের ভালো লাগেনি! তাদের একজন মোদীকে 'হিটলারের সমগোত্র' বলে মনে করেছেন। একজন নিঃস্বার্থ দেশসেবক এবং জনগণের উন্নয়ণের কাণ্ডারীকে এইভাবে চিত্রিত করা দৃষ্টিহীনতা ও সংকীর্ণ চিন্তার পরিচয়। সমালোচক ও একদেশদর্শীদের আচার-আচরণে নরেন্দ্র মোদীর বিচলিত হওয়ার দরকার নেই! কোনও প্ররোচনায় বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবারও দরকার নেই — এই আবেদনই প্রতিটি দেশবাসীরই। গুজরাট তথা ভারতের সামগ্রিক উন্নয়ণে নরেন্দ্র মোদী এগিয়ে চলুন।

রণজিৎ সিংহ, কলকাতা-৭০০০৩৬।

ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের সাংবাদিক

অরূপ বসু

জ ন ম ত

ক্ষুদ্র সংবাদপত্র (লিটিল ম্যাগাজিন) বলতে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকাই সাধারণত বোঝায়। তার সাথে আছে কিছু সাহিত্য কবিতার বইয়ের সংকলন। হুগলী জেলার বৈদ্যবাটিতে আমার নিবাস। ছাত্রাবস্থা থেকে কর্মজীবনের অবসরের পরও আমি দীর্ঘ কয়েক দশক এই ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের জেলার বহু পত্রিকার সঙ্গে আজও যুক্ত— লেখালেখি ও সংগঠনের কাজে। এছাড়া কলকাতা থেকে স্বনাম ধন্য বহুল প্রচারিত বহু দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর (মূলতঃ সমস্যা ও সমাধান) লিখে থাকি। দোষারোপ করে নয়।

প্রত্যহ সকালে চায়ের টেবিলে কোনও না কোনও বহুল প্রচারিত সংবাদ পত্র রসিয়ে রসিয়ে পাঠকরা পাঠ করে। কোনও সংবাদ নিয়ে দেখা যায় পাঠকদের মধ্যে তর্ক, উত্তপ্ত তর্ক, এমন কী হাতাহাতি হতেও দেখা গেছে। কিন্তু কোনও সংবাদপত্রের দপ্তর পাঠকরা আক্রমণ করেনি। বড় জোর দেখা গেছে চিঠিপত্রের কলমে কিছু প্রতিবাদপত্র ছাপা হয়েছে। বড় সংবাদপত্র পরিচালকদের অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষক আছে। আছে আইনি সহায়তা, পেশাগত সাংবাদিকদের ভাল নিরাপত্তা। এদের দেশি-বিদেশী সংবাদ সংগ্রহের নেটওয়ার্ক খুবই ভাল। পাঠক সংখ্যাও লক্ষাধিক। বলতে গেলে ভাল ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞাপন প্রচুর।

কিন্তু ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলির (স্থানীয় পত্রিকা) সমস্যা বহু। এই সংবাদপত্র চালাতে গেলে যে আর্থিক পৃষ্ঠপোষক থাকা প্রয়োজন — খুব কম সহৃদয় পত্রিকা-প্রেমী আছেন যারা এগিয়ে আসেন পত্রিকা নিয়মিতভাবে চালাবার জন্য। খুব কমই পত্রিকা আছে যা সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে প্রকাশিত হয়।

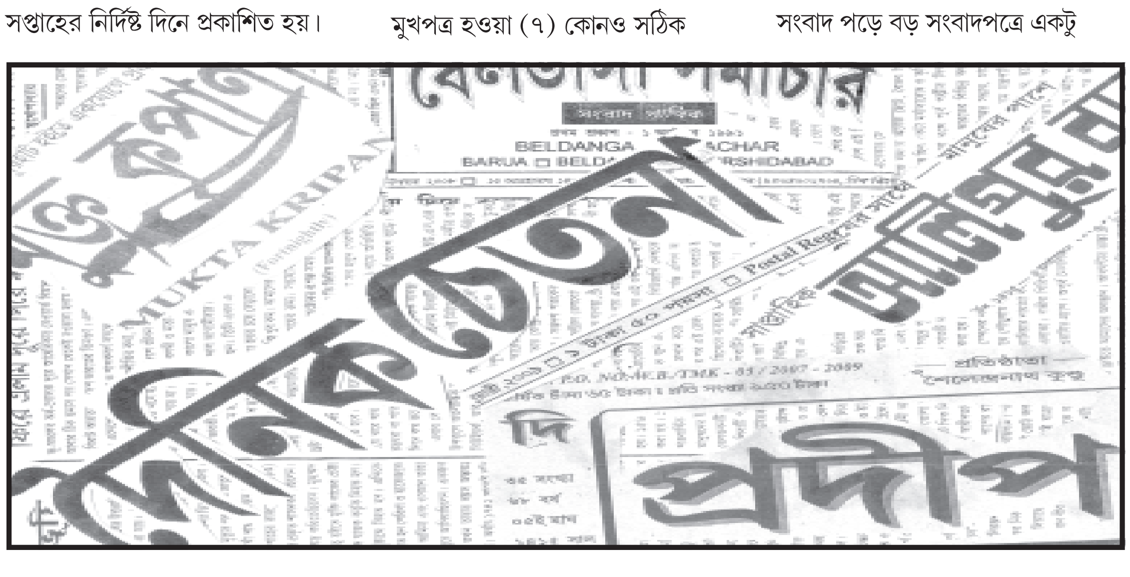

ফলে জনমানসে এই পত্রিকাগুলি মানুষের মনে রেখাপাত করে না। তবে এর পিছনে আছে বহুবিধ কারণ — (১) আর্থিক অসুবিধা (২) বিজ্ঞাপনের কম যোগান(৩) সংবাদ সংগ্রহের অভাব (সাংবাদিক কম) (৪) যারা একটু নির্ভীকভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে চান তাদের নিরাপত্তার অভাব (৫) এখনকার মানুষ বলে ওই যে অমুক পত্রিকার সাংবাদিক হে (ব্যঙ্গসহকারে) (৬) রাজনৈতিক চাপ বা রাজনৈতিক মুখপত্র হওয়া (৭) কোনও সঠিক সংবাদ কোনও পত্রিকা প্রকাশ করলে বা প্রতিবেদন লিখলে তার বাড়িতে হুমকি (৮) বহু সংস্থা আছে যাদের নাম পাড়ার পুজার লিফলেটে ছাপা হয় — যদি তারা কোনও অনুষ্ঠান করে, আর তাতে যদি কোনও ব্যক্তির নাম ছাপা না হয়, তখন পত্রিকার কপালে জোটে অকথ্য গালিগালাজ।

তবে এই সব স্থানীয় পত্রিকার কিছু সম্পাদক ও সাংবাদিক নিজেকে অনেক সময় "কেউকেটা ভাবে।" অনেক সময় অনৈতিক পথে রোজগারের জন্য ব্ল্যাকমেলও করে থাকে। এটা কাম্য নয়।

বহু বড় সংবাদপত্র খুললেই দেখা যায় যে, স্থানীয় সংবাদপত্রের বহু সংবাদ পড়ে বড় সংবাদপত্রে একটু ঘুরিয়ে প্রকাশিত হয়। তখন বাসিন্দারা বলেন, তোমরাই তো খবরটা আগে দিয়েছিলে। বহু প্রতিবেদন প্রকাশ হয়, যা বহু বড় কাগজে প্রকাশিত হয় না।

তবে সুখের কথা যে (যদিও আমার নিজস্ব কথা) আমি স্থানীয় বহু সমস্যার কথা স্থানীয় পত্রিকার গঠনমূলকভাবে তুলে ধরেছিলাম উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে। তাতে ভাল সাড়া মিলেছে ও সমস্যার সমাধান হয়েছে। অনেকে বলেন, আপনি সমস্যার কথা লিখুন। ঠিক তেমনি কিছু ভোগবিলাসী "গৌরী সেন মার্কা" রাজনীতির নেতাদের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে হুমকিও পেয়েছি। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে দেখা যায় কোনও সমন্বয় নেই। নাম-কা ওয়াস্তে ব্লক ও মহকুমার একটা প্রেস ক্লাব আছে। তারা নিজেরাই ব্যস্ত কীভাবে সরকারি বিজ্ঞাপন পেয়ে ৩০০/৫০০ কপি ছাপায়। খুব হাসি পায় অকাট মুর্খ কিছু আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বেআইনী পথে রোজগার যা অপরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে কিছু সমর্থককে বোকা বানিয়ে নিজের আখের গোছানো বা সমাজসেবী হওয়া, সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরে। এদের মুখোশ খুললেই বাবুরা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। তবে স্থানীয় সংবাদপত্র এমনিতে জনমনে রেখাপাত কম করে। যদি সম্পাদক ও সাংবাদিকরা নিজেরটা একটু কম বুঝে, জনস্বার্থর দিকটা মানুষকে সঠিক ভাবে বোঝাবার জন্য সংবাদ ঠিক মতন পরিবেশন করেন। আমার দৃঢ় ধারণা এরাই একাধারে ত্রাসের কারণ হয়ে উঠবে। সম্পাদক ও সাংবাদিকদের কেউ হেয় করবে না। তখন সবাই বলবে "অমুক পত্রিকা আছে"। অবশ্যই প্রশাসনের সাহায্য চাই।" মেরুদণ্ড সোজা থাকলে প্রশাসনই পারে এদের এক নম্বর পৃষ্ঠপোষক হতে। সরকার এগিয়ে আসুক এটাই কাম্য।

দক্ষিণের অযোধ্যা ভদ্রাচলম্

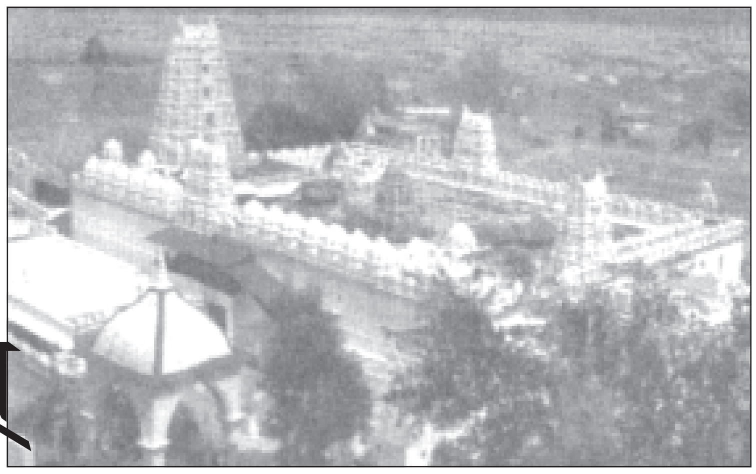

পরম্পরা

রুদ্র রায়

ভারতবর্ষের সাধু-সন্তরা বিশ্বাস করেন জগতের প্রত্যেক প্রাণী ভগবান শ্রীরামের নামে জীবন ধারণ করে, এই জগৎ-সংসার তাঁরই ইচ্ছায় পরিচালিত। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, "দেশটাকে তুলতে হলে মহাবীরের পূজা চালাতে হবে। শক্তিপূজা চালাতে হবে, শ্রীরামের পূজা ঘরে ঘরে করতে হবে। তবে তোদের ও দেশের কল্যাণ নতুবা উপায় নেই।" ভগবান শ্রীরামের জীবন চরিত আমাদের কাছে আলোক বর্তিকা। তাঁর স্মৃতি বিজড়িত স্থান শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বের মানুষের কাছেও তা তীর্থভূমি, পুণ্যভূমি রূপে পূজিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে বুদ্ধদেব বসুর মতো সাহিত্যিকেরাও জগৎ সংসারের সকল তর্ক-বির্তকের উর্দ্ধে আদর্শ ত্যাগী পুরুষ হিসাবে শ্রীরামের চরিত্র কল্পনা করেছেন। ভগবান শ্রীরামের স্মৃতি বিজড়িত এমনই এক গৌরবময় তীর্থস্থান হল অন্ধ্রপ্রদেশের খম্মম জেলার ভদ্রাচলম্। চিত্রকূটের পরে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর বনবাস কালের বেশি সময় কাটিয়েছিলেন ভদ্রাচলমের বনে। রামজন্মভূমি অযোধ্যার পরেই, ভদ্রাচলকে দক্ষিণের অযোধ্যা বলা হয়ে থাকে। অনেকের মতে, রাবণ সীতাদেবীকে ভদ্রাচলমের কুঠীর থেকেই অপহরণ করেছিল। সীতাদেবী তাঁর ভিজে বস্ত্র যে পাথরের ওপর মেলতেন, সেই পাথর আজও ভদ্রাচলম্-এ দেখতে পাওয়া যায়।

ভদ্রাচলম্-এর অপর গুরুত্বপূর্ণ দিক হল — ভদ্রাচলম্ অঞ্চলটি জনজাতি প্রধান। জনজাতিদের কাছে রামমন্দিরের গুরুত্বও অনেক বেশি। তাদের বিশ্বাস ভগবান শ্রীরামের আশীর্বাদ সর্বদা তাদের সঙ্গে আছে। খৃস্টান মিশনারীরা এখনকার জনজাতিদের বারবার ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করলেও, শ্রীরামচন্দ্রের মহিমায় তারা কখনও কোনও জনজাতিকে ধর্মান্তরিত করতে পারেনি। এটা কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়। এক স্থানীয় বাসিন্দার মতে, 'মিশনারীরা বহুবার আমাদের ধর্মান্তরিত হতে প্রলোভিত করেছে। কিন্তু আমাদেরকে প্রভু যেন বারবার এই বিপদের মুখ থেকে রক্ষা করেছেন। মনে হয়েছে, আমরা কোনও পাপ করতে চলছি। এসবই তাঁর (শ্রীরাম) ইচ্ছা'। ভদ্রাচলমের রামমন্দিরের নির্মাণ বনবাসীদেরই হাতে। মন্দির নির্মাণের কাহিনীটা বেশ মজার।

পোকলা দমমকা নামে এক বনবাসী বৃদ্ধা ভদ্রিরেড্ডীপালেম্ গ্রামে বাস করতেন। তার রাম নামে এক পালিত সন্তান ছিল। একদিন ঘটনাচক্রে রাম বনে হারিয়ে যায়। বৃদ্ধা পোকলা রামের খোঁজে বনের গভীরে পৌছে যায়। যে রাম রাম বলে চিৎকার করতে থাকে। বনের ভিতরের এক গুহা থেকে আওয়াজ আসে — 'মা আমি এখানে'।

পোকলা আওয়াজ শুনে এগিয়ে যেতেই দেখেন ভগবান শ্রীরাম, লক্ষণ ও সীতার মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে তার ছোটো রাম। দুই রাম আর লক্ষণ, সীতা দেবীর বিগ্রহ দর্শনে বৃদ্ধা একদিকে স্নেহ, অন্যদিকে ভক্তিতে বিগলিত হয়ে পড়েন। তিনি গুহার মধ্যে পাওয়া রাম-লক্ষণ সীতার বিগ্রহ তিনটিকে একটি বাঁশের তৈরি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন। বৃদ্ধার ওই বাঁশের মন্দিরেই মানুষের পূজা-অর্চনা শুরু হল। খুব শীঘ্রই ভদ্রগিরি বা ভদ্রাচলমের ওই মন্দির বনবাসী এবং নগরবাসীদের কাছেও তীর্থস্থানে পরিণত হয়। পাহাড়ী পরিবেশ প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিকতার মিলনক্ষেত্র-র রূপ ধারণ করে।

গৌলকুন্ডার কতুবশাহীর (বর্তমানে যা হায়দরাবাদ) নবাব অবুল হোসন ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। কিন্তু তার তহশীলদার কুঞ্চলী গৌপন্না বৃদ্ধার ওই বাঁশ — মন্দিরের সংস্কার করেন। তা বড় মন্দিরে রূপ দেন। তিনি রাজ্যে আদায়কৃত খাজনা থেকে শ্রীরামের এই মন্দির তৈরি করেছিলেন।

গৌপন্না শুধু মন্দিরই তৈরি করলেন না। সেই সঙ্গে তিনি বিগ্রহগুলিকেও বিভিন্ন অলংকারে সজ্জিত করলেন। গৌপন্না ভগবান শ্রীরামের বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের ওপর বহু ভজন রচনা করেন। তাঁর ভজনের জন্য সবাই তাঁকে রামদাস বলতেন। বাংলাদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধেও তিনি ভক্তিগীতি রচনা করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন কবীর। তিনি রামদাসকে রামানাদী সম্প্রদায়ে দীক্ষিত করেন। রামদাসের কীর্তন গ্রাম-গঞ্জে প্রচার হতে লাগল। হরিদাস নামে সম্প্রদায়টি এখনও রামদাসের কীর্তন করে।

কিন্তু রামদাসের এই আধ্যাত্মিক জাগরণ তথা প্রচার উচ্ছৃঙ্খল নবাবের পছন্দ ছিল না। তিনি রামদাসকে বন্দি করেন। রামদাসকে নবাব যেখানে বন্দি করে রেখেছিলেন সেই কালকুঠারী আজও দেখতে পাওয়া যায়। অনেকের মতে রাম-লক্ষণ নিজে অতি সাধারণের বেশ ধরে নবাবের কাছে উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁরা রামদাসকে মুক্ত করার পরিবর্তে, নবাবের হাতে একটি 'রামের' মুদ্রা দেন। রামের লীলা অপার। মুদ্রা কাজে রাখার ফলে নবাবের মনে অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। তিনি রামদাসকে সসম্মানে মুক্ত করেন। নবাবের মধ্যে ভগবান শ্রীরামের প্রতি ভক্তিভাব জেগে ওঠে। এর পর থেকে তিনি প্রতি বছর রামনবমীর দিন রামমন্দিরে পুজো দিতেন, সপরিবারে। প্রতি বছর জনগণকে স্বর্ণ ও মতি (মুক্ত বা মূল্যবান রত্ন) বিতরণ করতেন। এই ভাবে রাম-মন্দির হিন্দু মুসলিম সৌহাদ্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। আজও এই প্রথা চালু আছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবছর ভক্তদের মোতি দান করা হয়।

মন্দিরে শোভিত রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের বিগ্রহ।

১৯৩০ সালে একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার পক্ষ থেকে ভদ্রাচলমে রামদাসের প্রতি সম্মান জানিয়ে রামদাসের মন্ডপ তৈরি হয়। সেকুলারবাদীদের জন্য আজ ভদ্রাচলমের এই পবিত্রস্থান সুরক্ষিত নয়। খৃস্টান মিশনারীদেরও দৌরাত্ম্য বেড়েছে।

আয়ুর্বেদিক চক্ষু চিকিৎসা

নিরাময়

রবীন সেনগুপ্ত

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় ৭০টিরও অধিক নানা ধরনের চক্ষু সংক্রান্ত সমস্যার বর্ণনা পাওয়া যায়। নেত্র মন্ডলকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা আছে। 'পক্ষমন্ডলমেকং তু দ্বিতীয়ং চর্ম্মমন্ডলম্। শুক্লং তৃতীয়ং কথিতং চতুর্থং কৃষ্ণমন্ডলম্, দৃঙমন্ডলম্ পঞ্চ মং ....'— এই শ্লোক থেকে জানা যায় যে নেত্রমন্ডলের পাঁচটি অংশের সংস্কৃত ভাষার নাম — ১) পক্ষমন্ডল ২) চর্ম্মমন্ডল ৩) শুক্লমন্ডল ৪) কৃষ্ণমন্ডল এবং ৫) দৃঙমন্ডল।

সংস্কৃত ভাষায় আয়ুর্বেদ পন্ডিতগণ যেটিকে অক্ষিপট নামে অভিহিত করতেন ইংরাজি ভাষায় সেটিকেই 'রেটিনা' বলা হয়। চোখের আবরণ বা ঝিল্লীকে বলা হয় কর্ণিয়া। তাছাড়া দূরদৃষ্টিবদ্ধ তা (Myopia), দৃষ্টিক্ষীনতা, ছানি, রাত্রান্ধ্যতার মতো চক্ষুরোগগুলির নাম সংস্কৃত শব্দ ভান্ডার থেকেই গৃহীত। অচ্ছোদপটল, কণীনিকা, অশ্রুগ্রন্থি — চক্ষুর এই সকল অংশের নামকরণও সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। আয়ুর্বেদিক ধারায় অক্ষিপটে আলোক গ্রহণশক্তি দানকারী রাসায়নিক পদার্থটিকে আলোক পিত্ত বলা হয়। আর চক্ষুতে প্রয়োজনীয় রসধাতু সরবরাহকারী তরলকে বলা হয় অর্পক শ্লেষ্মা।

চক্ষুতে ছানি পড়ার কারণ হিসাবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলে যে, দেহের অগ্নি অর্থাৎ পিত্ত যখন প্রকুপিত হয়, যকৃৎ দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয় এবং সর্বদেহের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন আলোচক পিত্ত নিজের বিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারে না। অবিশুদ্ধ পিত্ত চোখের পটল বা স্তরগুলিকে একে একে বিযাক্ত করে তাদের দৃষ্টিগ্রহণের ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তখনই চোখে ছানি পড়তে শুরু করে।

আর চোখ কখনও রাত্র্যন্ধতা ও অন্যান্য কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত হয়? এই প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদের তত্ত্বগুলি সংক্ষিপ্তসার করলে দেখা যাবে যে দেহে শুধু শ্লেষ্মা দোষ ঘটলে শ্লেষ্মার সার তর্পক শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়ে এই রোগগুলির সৃষ্টি করে।

অত্যাধিক মৈথুন এর ফলে ধাতুক্ষয় থেকেও অনেক সময় চোখের দর্শন ক্ষমতা কমে যায়।

ধ্যানসিদ্ধ সাধকরা তাঁদের দিব্য দৃষ্টি লাভের ফলে প্রায়শই বিদ্যুৎ বর্ণের ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করে থাকেন। এছাড়াও সাধারণের দৃষ্টির বাইরে থাকা বিভিন্ন সত্তা যথা দেব দেবী গন্ধর্ব প্রেত এসবও এনাদের নজরে আসে। কিন্তু এসবই হল আত্মার ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে প্রাপ্ত দৃষ্টি। বাহ্যিক চক্ষু কিন্তু সিদ্ধ সাধকদের ক্ষেত্রেও রোগাক্রান্ত হয়। এনাদের চক্ষুরোগের কারণকে আর্য়ুবেদে অনিমিত্ত কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিষয়ে একটা শ্লোক পাওয়া যায়। শ্লোকটি হল — সুরর্ষিগন্ধর্ব মহোরগানাং সন্দর্শনেনাপি চ ভাস্করস্য হন্যেত দৃষ্টিমনুজস্য যস্য স লিঙ্গ নাশস্ত নিমিত্ত সংজ্ঞ। তত্রাক্ষি বিস্পষ্ট মিবাবভাতি বৈদূর্যবনা বিমলা চ দৃষ্টি বিদীর্যতে সীদতি হীয়তে বা নৃণামভি ঘাতকতা তু দৃষ্টিঃ....।

প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রগুলিতে চক্ষুরোগের জন্য অজস্র ঔষধের ফর্ম্মুলা যথারীতি রয়েছে। দৃষ্টিশক্তিক্ষীণ হয়ে গেলে তা বৃদ্ধির জন্য আশিটি তিলপুষ্প, আশিটি জাতি পুষ্প, গুগ্গুলু, নিম, আমলকী, শুন্ঠী, পিপ্পলী, নটেশোক এই সমস্ত দ্রব্যকে তন্ডুলোদকের সাথে পেষণ করে বাটিকা নির্মাণের কথা এক স্থানে বলা আছে, যার দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করলে উপকার পাওয়া যায়। রাত্র্যান্ধতা রোগ নির্মূলের জন্য ভেলার আটির শাঁস, নাভিশঙ্খ, মনঃশিলা, নিমপাতা ও মরিচ এই সমস্ত দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষন করে চক্ষুতে অঞ্জন দেওয়ার বিধি শাস্ত্রে উল্লেখিত রয়েছে।

অটজুষক মূলন্ত কাঞ্জিকপিষ্টমেব তু, তেনাক্ষোভুরিলেপাচ্চ চক্ষুঃশূলং বিনশ্যতি — এই শ্লোকটি থেকে জানতে পারা যায় যে বাসকের মূল কাঁজিতে পেষন করে চক্ষুতে প্রলেপ দিলে চক্ষুঃশূল নষ্ট হয়।

সৈন্ধবং কটু তৈলঞ্চ অপামার্গস্য মূলকম্। ক্ষীরকাঞ্জি কসংঘৃষ্টং তাম্র পাত্রে তু তেন চ। অঞ্জনাৎ পিঞ্জটসৈব নাশো ভবতি শঙ্কর — এই সংস্কৃত শ্লোক অনুযায়ী সৈন্ধব কটুতৈল, অপামার্গের মূল এই সমস্ত দ্রব্য তাম্রপাত্রে দুগ্ধ ও কাঁজির সাথে পেষন করলে যে ওষুধ প্রস্তুত হয় তা

সত্য নিষ্ঠা

বোধ কথা

সতীনাথ রায়

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নাতেশন কী যেন একটা ভাবছিল। রাস্তার ওপরেই তার অফিস। বড় বড় জানালাগুলি দিয়ে উঁকি দিলে গোটা শহরটা দেখা যায়। অদ্ভুত সে দৃশ্য। চেনা শহর হলেও, বার বার যেন দেখতে ইচ্ছা করে। নাতেশন কাজের ফাঁকে প্রায়ই জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। এখানে দাঁড়ালে সারাদিনের ক্লান্তি যেন নিমেষে কেটে যায়। অফিসটা তৈরির সময়ই সে বলেছিল, 'জানালাগুলো যেন বড় রাখা হয়'। তার হিসাব মতোই বড় বড় জানালা বসানো হয়েছে ঘরটিতে।

নাতেশন বেশ কিছুক্ষণ ধরে এক অপরিচিত ব্যক্তির মোজা কেনা লক্ষ্য করছিল। ভদ্রলোক বার বার খুঁটিয়ে দেখছিলেন মোজাগুলিতে কোনও খুঁত আছে কিনা। তার মোজা কেনা দেখে নাতেশন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তার সেই পুরনো দিনের কথা খুব মনে পড়তে লাগল।

একদিন মোজা সেলাই করে জীবন কাটিয়েছে সে। আজ সেই কিনা অফিসের বস। জীবনে ঝড়-ঝঞ্ঝাট কম যায়নি। বড়ই বেদনাদায়ক সে স্মৃতি। সে নিজেও সেসব দিনগুলো মনে করতে চায় না। সারাদিন অফিসে পিওন হিসাবে কাজ করেও সংসার চলত না। রাত্রির সময়টুকুও বসে কাটাবার উপায় ছিল না তার। পরিবারের কথা ভেবে রাতে মোজা সেলাই করার কাজ ধরেছিল নাতেশন। দু'বেলা কাজ করলেও, অভাব মিটত না। শুধু কোনও মতে ঠেকা দিয়ে সংসার চালাচ্ছিল। নিজে ব্যবসা করার কথা নাতেশন কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি। উপায় না থাকায়, গতানুগতিক ভাবেই জীবন কাটাতে লাগল।

সেদিন রাতে বন্ধুর পরামর্শটা কাজে লেগেছিল নাতেশনের। বাড়ি ফেরার পথে দেখা হয় তার সঙ্গে। সে-ই পরামর্শ দিয়েছিল ব্যবসার। বলেছিল, 'পেঁয়াজের ব্যবসা কর। লাভ হবে। দুটো টাকার মুখ দেখতে পাবি'। পেঁয়াজের ব্যবসায় লাভের তুলনায় লোকসানের কথা ভেবে প্রথমে রাজি হয়নি নাতেশন। তাছাড়া টাকা-কড়ির ব্যাপারটাও ভাবাচ্ছিল তাকে। তবে শেষ পর্যন্ত কোনও ক্রমে রাজি হল। নাতেশন ভাবল এভাবে দুর্দশায় কাটানোর থেকে তো ভালো। ভালো বা মন্দ যেটা হবে হোক। সংসারের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত ঝুকি নিল সে। নির্দিষ্ট একটা দিন দেখে পেঁয়াজের ব্যবসা শুরু করল নাতেশন। তবে বাড়ির লোককে তা জানালো না। পরিবারকে কখনও সে বিব্রত করেনি। এখনও বাইরের সব ঝুট-ঝামেলার কথা বাড়িতে বলে না। বাড়ির লোক পাছে কষ্ট পায়। নিজের মধ্যেই সবকিছু চেপে রাখে সে।

ব্যবসার শুরুটা খারাপ হল না। লাভের মুখ বেশি না দেখলেও, লোকসান হল না। আস্তে আস্তে বিক্রি-বাটাও বাড়ল। মোজা সেলাইয়ের কাজ ছেড়ে দিল সে। ব্যবসায় আগের থেকে বেশি সময় দিতে লাগল। বাড়ির লোকও আস্তে আস্তে সব কিছু জানতে পারল। তারাও নাতেশনকে সমর্থন করল — পাশে দাঁড়াল। পেঁয়াজের ব্যবসা থেকে যা রোজগার হতে লাগল, তাতে দিব্যি সংসার চলে যায়। রোজগার ভালো হচ্ছে দেখে, এবার সে পিওনের কাজটাও ছেড়ে দিল।

পুরোপুরি ব্যবসায় মনোনিবেশ করল নাতেশন। পেঁয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজ পণ্য বিক্রিও শুরু করল। দুই ব্যবসাতেই ভালো লাভ হতে থাকল। কয়েক বছরের মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন হল। নাতেশন ব্যবসায় বেশ ধনী হয়ে উঠল। সে নিজের ব্যবসার জন্য অফিস খুলল। সেখানে তারই মতো অনেকে কাজ করছে। সংসার চালাচ্ছে। ঘটনাটা তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনম শহরের। ঘটনাটি সত্য।

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

অনেক পড়ুয়া আছেন, যারা মাঝপথে বই পড়া বন্ধ রাখতে পাতার এককোণ মুড়ে রাখেন, যাতে পরে নির্দিষ্ট জায়গাটি চটজলদি খুঁজে পাওয়া যায়। ইংরেজিতে এই বদ অভ্যাসটাকে বলে 'ডগ ইয়ার' বা ইয়ার মার্ক' করে রাখা। ব্যাপারটা এসেছে বৃটেন থেকে। যদিও কুকুর নয়, বৃটেনের রাখালরা নিজেদের গরু-বাছুর চিহ্নিত করার জন্য গরুর কান বিভিন্ন আকারে খাঁজ কেটে ভাঁজ করে রাখত। তাই 'ইয়ার মার্কড'।

* * *

হুগলির এক কারখানায় বোমা বাঁধতে গিয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় রবি ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে আর আই অপথ্যালমলজিতে ভর্তি করাবার পর, তাঁর চোখ থেকে অস্ত্রোপচার করে আস্ত একটি চামচ বার করা হয়। চোখ থেকে আস্ত একটি চামচ বার করার এমন নজির নেই বলে জানান চিকিৎসকরা। চামচের লম্বা অংশটি চোখের মণি ভেদ করে কানের দিকে চলে গিয়েছিল আর মাথার দিকের অংশটি বেরিয়েছিল বাইরে।

* * *

শাহজাহানের মর্মরসৌধ তাজমহল যারা তৈরি করেছিল, তাদের অনেকের হাত কেটে ফেলা হয়, চোখ উপড়ে নেওয়া হয়। বাকিদের হত্যা করা হয়েছিল। কারণ,সম্রাট চাননি তাজমহলের কোনও জুড়ি থাকুক। শোনা যায়, এক নাঙ্গা ফকির ছিল তাজের আসল আর্কিটেক্ট। যমুনার পাড়ে তাকে দাঁড় করিয়ে সূর্যের আলোয় তার ছায়া দেখে দেখে মাপ নিয়ে প্রথম তৈরি হয় তাজের ভিত। তাজ গড়া হয়ে গেলে শাহজাহান ফকিরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কি যমুনার ওপারে অবিকল কালো রঙের একটি তাজ গড়তে পারবে?' 'পারব জাঁহাপনা' — একথা বলার পর ওই ফকিরকে আর কখনও দেখা যায়নি।

* * *

বড়দিনের ছুটির পর কিছুতেই স্কুলে যাবে না ১০ বছরের দিয়েগো গঞ্জালেস। শক্ত আঠা হাতে লাগিয়ে সেঁটে ধরেছিল খাটে। বাড়িশুদ্ধ তোলপাড়। কিছুতেই খোলা যাচ্ছিল না। অগত্যা ফোন পুলিশকে। ডাক্তার এসে ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় আঠা গলিয়ে হাত খুললেন। কিন্তু ততক্ষণে স্কুলের সময় পেরিয়ে গেছে।

* * *

চম্পারনের স্থানীয় মানুষ কস্মিনকালে রেলে চড়তে টাইম টেবল ওল্টায় না, টিকিট কাটা তো দূরস্থান। সুতরাং স্টেশনে যাবারও প্রয়োজন হয় না। রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে একটি দশ টাকার নোট নাড়লেই ট্রেন চালক থেমে যাবেনই। চালকের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে যাত্রীরা ট্রেনে উঠে পড়ে। বছরের পর বছর চলে আসছে এ ধারা।

* * *

হলুদ ফুল মেরিগোল্ড ফুটবে চাঁদে। ২০১৫ সাল নাগাদ — এরকমই আশা ইউক্রেনীয় বিজ্ঞানীদের। টিউলিপও ফোটাতে চান তাঁরা। কারণ পাথুরে মাটিতে জল ছাড়াই এসব ফুলের গাছ বাড়ে। ফুলও ফোটে। লন্ডনের বিজ্ঞানী ডক্টর ফোয়াং জানিয়েছেন, এই পরিকল্পনা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। চাঁদ ভরে উঠবে ফুলে ফুলে। **— নির্মল কর**

ত্রিপুরার সন্ত

শ্রী প্রেমাঞ্জন দাস

ডঃ জগদীশ গণ চৌধুরী

পার্বত্য ত্রিপুরার অন্তর্গত কোনাবন নামক গ্রাম-নিবাসী শ্রীগোপালচন্দ্র দেবনাথ ও শ্রীমতী যোগমায়া দেবী নামক দম্পতির অন্যতম পুত্র হলেন শ্রী প্রদীপ দেবনাথ। প্রদীপের জন্মতিথি হল আনুমানিক মঙ্গলবার, ৭ ভাদ্র, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ১৯৬০ খৃস্টাব্দে। প্রদীপই উত্তরকালে শ্রী প্রেমাঞ্জন দাস নামে খ্যাত হন এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্ঘের ত্রিপুরা শাখাতে দায়িত্বপূর্ণ পদে ব্রত আছেন।

সমতল ত্রিপুরার কুমিল্লা ভূ-ভাগে মন্দভাগ নামক জনপদের অন্তর্গত দেউস নামক গ্রামে বংশানুক্রমে এই পরিবার বসবাস করে আসছেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনজনিত রাষ্ট্র-বিপ্লবের অন্যতম শিকার হয় এই পরিবার। বিতাড়িত হয়ে নিকটবর্তী পার্বত্য ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিলেন অম্বিরাম দেবনাথ।

সিংহরাশিযুক্ত এই নবজাতক যৌবনে বৈরাগ্যভাবে ভাবিত হয়ে উঠবে বলে কুষ্ঠি নির্মাতা আচার্য ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। প্রদীপের শৈশব, বাল্য, কৈশোর এবং যৌবন ত্রিপুরাতে অতিবাহিত হয়েছে। প্রদীপ আবাল্য সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন।

প্রদীপ বরাবরই মেধাবী ছাত্র। পড়াশুনার প্রতি প্রদীপের আগ্রহ প্রচণ্ড। তাই একের পর এক, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন বিদ্যার্থী প্রদীপ। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে গবেষণা করে প্রদীপ অতঃপর ডঃ প্রদীপ দেবনাথ নামে সম্মানিত।

বাস্তুচ্যুত হলেও তাঁদের পরিবার সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয়নি। ভাদ্র মাসে ধানের চারা রোপণের পর, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ — এই তিন মাস যাবৎ গ্রামবাসীরা রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ কীর্তন করে। বৈষ্ণবসেবা দেয়। এমন পরিবেশে প্রদীপের বাল্য ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছে।

শ্রী প্রেমাঞ্জন দাস

প্রদীপের পিতামহ ও পিতামহী এসবে নিজেরা অংশ নিতেন এবং নাতিকে সঙ্গে নিতেন। নাতি তাতে অংশ নিত মহানন্দে।

ছাত্র জীবনেই আশ্রমবাসী হয়ে পরমার্থের সন্ধান করতে প্রদীপ গৃহত্যাগ করে নানা রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। অবশেষে কলকাতাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের প্রকাশিত পুস্তক পড়ার সুযোগ ঘটে।

এই সংঘের আচার-বিচার পছন্দ হয় প্রদীপের। স্নাতকোত্তর পরীক্ষা সমাপ্ত করে ঐ সংঘে যোগদান করেন ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে। ১৯৮৬ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত এই সংঘে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় আছে এই তরুণ সাধকের। কলকাতা, মুম্বাই, মায়াপুর, মণিপুর, আগরতলা প্রভৃতি স্থানে সংঘের মঠ-মন্দির আছে। তাতে শিক্ষানবিশী হিসাবে কাজ করার দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে এই সাধক। ১৯৮৬ সালের শেষভাগে প্রাপ্ত দীক্ষা প্রদীপের জীবনের এক বিশেষ ধাপ। দীক্ষান্তে নতুন নাম হয় শ্রী প্রেমাঞ্জন দাস।

এই সংঘের আচার-বিচার অনুযায়ী সাধক প্রেমাঞ্জন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বিগত ২৩-১১-১৯৮৮ দিনাঙ্কে। সহধর্মিণীর নাম রূপমঞ্জরী দেবী, ১৯৯০ সালে তাঁদের ঘরে জন্মে এক শিশু, শিশুর নাম রাখা হয়েছে দামোদর পণ্ডিত দাস। সাধনভজনের পাশাপাশি পড়াশুনা করা, গবেষণা করা, পুস্তক রচনা করা, পত্রিকা পরিচালনা করা হল শ্রী প্রেমাঞ্জন দাসের মুখ্য কাজ। সমাজের সমস্যার প্রতি প্রেমাঞ্জন উদাসীন নন। অধঃপতন রুখতে তিনি বদ্ধপরিকর। তাঁর চরিত্রে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় দেখা যায়। এই কর্মযজ্ঞে দু'জন সহকর্মীর নাম তিনি বিশেষ ভাবে বললেন, তাঁরা হলেন শ্রী ব্রজবিহারী দাস এবং শ্রী বলরাম দাস। উভয়েই নিষ্ঠাবান, ভক্তিমান সাধক।

অনেক ঢাক-ঢোল পেটানো হচ্ছে

(৯ পাতার পর)

করবে। কিন্তু অচিরেই আমাদের ভুল ভাঙল মুজিব হত্যার মাধ্যমে। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে মৌলবাদীরা, আবার শুরু হয়েছিল ভারত বিরোধী আবহাওয়া। সেই সময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পুনরায় তা মাথাচাড়া দেয়। আর সংশয় এই কারণেই যে, আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতে রাজনীতিকরা শেষ কথা বলে না। সেখানে সামরিক বাহিনীর এক বিরাট ভূমিকা আছে। এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রে পালাবদল অনেক সময়েই ঘটেছে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে। আশঙ্কা তাই যে, এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না তো? ইতিমধ্যেই হাসিনার জীবনের ওপর দু-বার আক্রমণ হয়েছে। একবার এক বিস্ফোরণের পর তো তিনি একটা কানে বধির হয়ে গেছেন।

ক্ষমতায় ফিরেই হাসিনা বলেছেন যে, তাঁর সরকার সন্ত্রাস মোকাবিলায় প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যৌথ টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা। আওয়ামী লীগের জয় ভারতকে অনেকটাই নিশ্চিত করে। সাম্প্রতিককালে ১৯৯৬-২০০১ এই অঞ্চলে বাংলাদেশের সঙ্গে সবচেয়ে ভাল সম্পর্ক ছিল ভারতের। ওই সময়ে ক্ষমতায় আসীন ছিল আওয়ামী লীগ। ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান অনেকটাই সংবেদনশীল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জঙ্গি কার্যকলাপের নিরিখে। দুই দেশের মধ্যে অনেক বকেয়া ইস্যু রয়েছে যা দু'দেশের কল্যাণে সমাধান করা দরকার। যেমন বহির্বাণিজ্য, নদীর জলবন্টনের মতো বহুচর্চিত সমস্যা। এছাড়া বাংলাদেশের উচিত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্য দিয়ে সে দেশের বন্দর ব্যবহার করতে দেওয়া। পুরো ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে মায়ানমারের মধ্যে দিয়ে গ্যাস পাইপলাইনের ব্যবহার বহু প্রতীক্ষিত। এবারের হাসিনা সরকারের ওপর মানুষের প্রত্যাশা, ভারতের প্রত্যাশা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। হাসিনা পারবেন তো সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে?

— সময়ই তা বলবে।

কতটা সুখকর

(৯ পাতার পর)

পরিবর্তনের দাবি করেন। যখন ওবামা মনে প্রাণে চাইবে, অবশ্যই পারবেন বাংলাদেশ তথা হাসিনা'র পদক্ষেপে হস্তক্ষেপ করতে। সর্বোপরি ঘটনা হল, পৃথিবীর দরিদ্রতম মুসলিম রাষ্ট্রের ৭৫ শতাংশ ভোট পড়া, তাও এরকম একটা সুপরিকল্পিত নির্বাচনে, এক নতুন যুগ শুরুর জানান দিচ্ছে। বস্তুত, হাসিনা তাঁর দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিংটা ইসলামের মধ্যে থেকেই একটা নতুন সূচনা ও আত্মপরিশোধনের মধ্যে দিয়েই করবেন। এমতাবস্থায় হাসিনা তাঁর সমস্ত অপরিহার্য সমর্থন চাইছেন, যা তাঁর পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্য।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, দয়া করে প্রত্যুত্তর দিন

বিশাখা বিশ্বাস

২৬।১১।০৮-র পর সন্ত্রাসবাদী জেহাদী হানাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কয়েকজন দাগী জেহাদী হত্যাকারীকে ভারতের হাতে তুলে দেবার দাবিতে বেদ-মন্ত্রোচ্চারণের সুরেলা স্বরগ্রামে প্রতিদিন নিয়ম করে পাকিস্তানের প্রতি কঠোর হতে কঠোরতর হুঁশিয়ারি এবং সহবৎ শেখাবার হুমকি দিয়ে চলেছেন ভারতবর্ষের কংগ্রেসী বৃক্ষের পরগাছা স্বর্ণলতিকা পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী। সেই 'মহাবুদ্ধি ধর' বিচক্ষণ মন্ত্রী অতিসম্প্রতি আবার ধর্মতত্ত্ববিশারদের মতো দক্ষিণেশ্বরের দেব-দেউলে পরম প্রত্যয়ে ঘোষণা করেছেন —"ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ বলে কিছু হয় না, কোনও ধর্মই হিংসা ঘৃণা সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয় না, সব ধর্মই মানুষকে সৌভ্রাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ করে...."

মারহাববা। মারহাববা। এরই নাম ভূমা। আমাদের জ্ঞান যখন আমাদের সহজাত বোধ বা উপলব্ধির মধ্যে পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে তক্ষুণি তার নাম হয় ভূমা বা প্রজ্ঞা। ভারতবর্ষ বোধ ও বোধির দেশ। সেই দেশের বুদ্ধি ধর পররাষ্ট্র মন্ত্রীটি তাঁর তুলসী বনতুল্য পার্টিতে এরন্ড বৃক্ষের মতো বুদ্ধি দান করতে করতে বুদ্ধি র সীমানা অতিক্রম করে সম্প্রতি প্রজ্ঞায় পৌঁছে গেছেন। এবং প্রজ্ঞা এমনই একটি সম্পদ যে, একটিবার এই দ্রব্যটি অর্জিত হয়ে গেলে আমাদের কণ্ঠনিঃসৃত বাক্যগুলি তখন বাণী হয়ে জিহ্বা ও তালু ফুঁড়ে বাঁশীর সুরলহরীর মতো বিশ্বমানবের কর্ণ কুহুরে আছড়ে পড়বেই। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই নয়া প্রজ্ঞাপ্রেমিক পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কণ্ঠে আমরা শুনলাম সেই অমৃতবাণী 'সব ধর্মই মানুষকে সৌভ্রাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ করে।'

অতএব, যাবতীয় তত্ত্বকথার জন্যে যেমন টীকা টিপ্পনী দিতে হয়, আমাদের প্রজ্ঞাবান পররাষ্ট্র মন্ত্রীকেও তাই ব্যাখ্যা দিতে হবে, সব ধর্মই যদি একই সৌভ্রাতৃত্বের সৌরভ ছড়াতো তাহলে আবিশ্ব এই পৃথিবীতে সনাতন ধর্মের উপস্থিতিতে নতুন করে কেন আবার হরেক ধর্মের প্রয়োজন ছিল। তাকে বলতে হবে, কোন্ ধর্মের ঈশ্বর নির্দেশ দেন সেই ধর্মের পবিত্র মাসটি অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই মূর্তিপূজকগণকে যেখানে পাবে তাদের বন্দী করবে, তার পর তাদের হত্যা করবে (সুরা তওবা-আয়াত ৫)? তাকে বলতে হবে, কোনও ধর্ম বা সেই ধর্মের কোনও ঈশ্বর যদি এইভাবে নরঘাতকতার অনুমতি দান করেন যে, "স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী" বধ্য হতে পারে (সুরা বাকরাহ আয়াত ১৭৮), তাহলে সেই ধর্মও কেমন করে মানুষকে সৌভ্রাতৃত্বে উদ্‌বোধিত করতে পারে। সেই ধর্ম কী আমাদের মৃত্তিকায় শেকড়হীন গান্ধী পরিবারের পদসেবায় পটুত্ব অর্জনে অতুলনীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্যে সৌভ্রাতৃত্বের বংশীধবনি বহন করে আনে, যে ধর্মের ঈশ্বর সেই ধর্মে বিশ্বাসীদের বিধান দেন অন্য ধর্মের মানুষকে "যেখানে পাও

> **"আমাদের জ্ঞান যখন আমাদের সহজাত বোধ বা উপলব্ধির মধ্যে পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে তক্ষুণি তার নাম হয় ভূমা বা প্রজ্ঞা। ভারতবর্ষ বোধ ও বোধির দেশ। সেই দেশের বুদ্ধি ধর পররাষ্ট্র মন্ত্রীটি তাঁর তুলসী বনতুল্য পার্টিতে এরণ্ড বৃক্ষের মতো বুদ্ধি দান করতে করতে বুদ্ধি র সীমানা অতিক্রম করে সম্প্রতি প্রজ্ঞায় পৌঁছে গেছেন।"**

তাদের হত্যা করো"(সুরা-বকরা-আয়াত ১৯১)? মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ব্যাখ্যা করতেই হবে, মানুষকে এইভাবে মনুষ্যত্ব থেকে পশুত্বে অবতরণ করিয়ে মানুষকে কেমন করে 'সৌভ্রাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ' করা যায়।....

প্রজা মানুষকে এক অপার্থিব জ্ঞানসম্পদে গরীয়ান করে তোলে কিন্তু আমরা পার্থিব সত্ত্বার সাধারণ মানুষ। তাই আমাদের বোধগম্য হয় না, কেমন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রীবর সেই বোধে উদ্‌বোধিত হলেন যে, কোনও ধর্মই সন্ত্রাসে হিংসায় ঘৃণায় প্রশ্রয় দেয় না? আমার এই কণ্ঠস্বরকে যদি সাম্প্রদায়িক স্বরগ্রাম বলেও মনে হয়, তবু সেই কণ্ঠস্বরকে উচ্চে তুলেই মাননীয় মন্ত্রীপ্রবর-কে জিজ্ঞেস করি, কোনও ধর্মের ঈশ্বর অন্য ধর্মের আশ্রয়পুষ্ট মানবমন্ডলী সম্পর্কে মনে করেন 'অবিশ্বাসীরা তোমাদের খোলাখুলি শত্রু' (সুরা নিসা আয়াত ১০১)? অপর ধর্মে আস্থাশীলগণ অথবা এমনকী কোনও নাস্তিকের প্রতিও এই মনোভাব কী ঘৃণা এবং হিংসারও প্ররোচনা বলে বিবেচ্য নয়? পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রবর কী মনে করেন, সনিয়ার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের বদলে তিনি বিমান বসুর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টিতে বিশ্বাস করলেই তার জন্যে সনিয়াজী অপমানকর শাস্তির বিধান দেবেন? তা যদি মনে না করেন, তাহলে কণ্ঠনালি পরিস্কার করে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী জবাব দিন — কোনও ধর্মের ঈশ্বর অন্য ধর্মমতে আস্থাশীল মানবমন্ডলীর জন্যে "অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত" রেখে দেন (সুরা নিসা-আয়াত ১৫১) এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীর হৃদয়-উপলব্ধ বিশ্বাসের মতো সেই ধর্ম, বা ধর্মীয় ঈশ্বরটি 'মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের' উদ্‌বোধন ঘটায়? অবমাননাকর এই শাস্তির বিধান কী সেই ধর্ম বা সেইধর্মে বিশ্বাসী মানবমন্ডলীকে ধর্মের গন্ডি অতিক্রম করে মানুষের মধ্যে হিংসা ঘৃণা সন্ত্রাসের নিমিত্ত প্ররোচিত করে না? দিল্লীতে সনিয়াজীর কংগ্রেসের কর্ণধার, কলকাতায় বুদ্ধ-বিমান বসুদের 'আমাদের লোক' এবং অতি সম্প্রতি বাইরে শ্যামল ভেতরে লাল পশ্চিমবঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি এই ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে জানাতে অনুরোধ করি, যে ধর্ম একটি ধর্মাশ্রয়ী মানবমন্ডলীকে শেখায় অপর ধর্মের মানুষকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা চলবে না (সুরা নিসা-আয়াত ১৪৪) — সেই ধর্মও মন্ত্রীর কানে কেমন করে সৌভ্রাতৃত্বের বাঁশী বাজাতে পারে?....

সর্বধর্ম সমন্বয়বাদী পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে সবিনয়ে বলি, সব ধর্মের অন্তর্গত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই সর্বমানবের সাথে ভ্রাতৃত্বের ভাগ নেন, যদিও সব ধর্মই পৃথিবীর সব মানুষকে সেই বোধে উদ্বুদ্ধ হতে সমান ভাবে নির্দেশিত করে না। অলম্ বিস্তারেণ।...

(সুরা এবং আয়াতগুলি 'দ্য হলি কোরাণ' বাই আবদুল্লা ইউসুফ আলী এবং 'কোরানশরীফ' লেখক ডঃ ওসমান গানি থেকে পাওয়া)

সংস্কার ভারতীর নৃত্য কর্মশালায় অলকা কানুনগো

সংবাদদাতা।। সংস্কার ভারতী-র বীরভূম শাখার উদ্যোগে প্রাদেশিক নৃত্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল, বীরভূমের সিউড়ি শহরে। গত ১৭, ১৮ জানুয়ারি দু'দিন ব্যাপি কর্মশালার প্রশিক্ষক রূপে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নৃত্য সাধিকা অলোকা কানুনগো।

কর্মশালায় বিভিন্ন জেলা থেকে শিক্ষার্থীরা উপস্থিত হয়েছিলেন। মোট ৪৩ জন নৃত্য শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নেন। ওড়িশি নৃত্যের উপর প্রশিক্ষণ দেন অলকা কানুনগোও তাঁর সুযোগ্য ছাত্রী মধুছন্দা চক্রবর্তী। কর্মশালার প্রথম দিনের সন্ধ্যায় মধুছন্দা চক্রবর্তী একক নৃত্য পরিবেশন করেন। সিউড়ি শাখার পক্ষ থেকে প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পীকে সম্মান জানানো হয়। সংস্থার সিউড়ি শাখার সভানেত্রী, লোক সম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী সম্মান জ্ঞাপন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সংস্কার ভারতীর প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদিক নীলাঞ্জনা রায়, প্রাদেশিক কোষাধ্যক্ষ শ্যামল ভট্টাচার্য, প্রাদেশিক সহ সভাপতি সোমেশ্বর বড়াল প্রমুখ। সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে আলকা কানুনগো বলেন, ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে সংস্কার ভারতীর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

বি এম এস-এর ২২ তম রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৬-২৭ জানুয়ারি বর্ধমান জেলার বার্ণপুর ইস্পাত নগরীর সম্প্রীতি প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় মজদুর সঙেঘর ২২ তম রাজ্যসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ৪০০-র অধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বি এম এসের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক কৃষ্ণ চন্দ্র মিশ্র, সম্পাদক সুরেশ প্রসাদ সিন্‌হা, বৈজনাথ রায়সহ অন্যান্য ক্ষেত্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। (১) এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিপুল অর্থ বেসরকারী ব্যাঙ্ক ও প্রতিষ্ঠানগুলির হেফাজতে রাখার একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সি বি আই তদন্ত করতে হবে। (২) অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বিল পুনর্বিচার করতে হবে। (৩) ঠিকাদারী প্রথা তুলে ঠিকাদার শ্রমিকদের স্থায়ী কর্মী হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। (৪) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পর বিশ্ব পুঁজিবাদের পতনে ভারতকেই তৃতীয় পথের নেতৃত্ব দিতে হবে। (৫) পোর্ট এন্ড ডকের পুরাতন স্কীমের মাধ্যমে অস্থায়ীদের স্থায়ীকরণ, কলকাতা বন্দরে জাহাজ আসার সুবন্দোবস্ত এবং সি আই ডব্লু পি সি কোংকে পোর্ট এন্ড ডকের সঙ্গে মার্জ করা, আর ব্রেথওয়েট কোংকে ভারতীয় রেলের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।

কাযকর্তারা বর্তমান পরিস্থিতিতে মজদুর সঙেঘর সদস্যদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেন। শোভাযাত্রা ও প্রকাশ্য সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়।

মালদায় সংস্কার ভারতীর প্রজাতন্ত্র দিবস

২৬ জানুয়ারি মালদার সংস্কার ভারতীর ব্যবস্থাপনায় প্রজাতন্ত্র দিবসে মালদার নেতাজী সুভাষ রোডের সরস্বতী শিশু মন্দিরে আয়োজন করা হয়েছিল — ভারত মাতা পূজা। সেই উপলক্ষে আয়োজিত এক সঙ্গীত অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন মালদা বিভাগের প্রাক্তন সঙঘচালক ভুবনেশ্বর দাশ। প্রধান বক্তা হিসাবে দিনটির তাৎপর্য ও সংস্কার ভারতীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর উত্তরবঙ্গ প্রান্তের বৌদ্ধিক প্রমুখ প্রবীর মিত্র। রূপক বিশ্বাস এবং অঙ্কিতা মুখার্জি আবৃত্তি এবং সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে সরস্বতী শিশু মন্দিরের ছাত্রী অর্চিতা চ্যাটার্জী, দিশানী দাস ও দীপশিখা বিশ্বাস।

সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্গীতা দে, বন্দনা রায়, সঞ্চি তা রানা, সজ্জল দত্ত, তাপস চক্রবর্তী, রত্না নন্দী। গীটার বাজিয়ে শোনায় তাপস চক্রবর্তী, তবলায় ছিলেন শুভেন্দু চৌধুরী। এদিন বিশেষ শিল্পী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তপতী বাড়ুরী, দূরদর্শন ও বেতার শিল্পী জগন্নাথ দে ও শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্কার ভারতীর জেলা সভাপতি দীনেশ কুমার দে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পরেশচন্দ্র সরকার।

শোক সংবাদ

চলে গেলেন খড়গপুর মহকুমা কার্যবাহ স্বদেশ ফৌজদারের পিতৃদেব কালীসাধন ফৌজদার। গত ১৯ জানুয়ারি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। এক পুত্র এক কন্যাসহ নাতি-নাতনিরা বর্তমান।

মঙ্গলনিধি

গত ১৭ জানুয়ারি তাম্রলিপ্ত জেলার, তমলুক মহকুমা শারীরিক প্রমুখ দেবাশীষ পাখিরার বৌভাত অনুষ্ঠানে, মঙ্গলনিধি স্বরূপ ১১১ টাকা, মহকুমা কার্যবাহ ভগীরথ মান্নার হস্তে প্রদান করেন প্রফুল্ল পাখিরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পাঁশকুড়া নগর কার্যবাহ বিজয় জানা, খন্ড কার্যবাহ যুগলকিশোর জানা ও অন্যান্য স্বয়ংসেবকবৃন্দ।

খেলার জগৎ

সোমদেব-এ আস্থা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। সোমদেব দেব বর্মণ, সুবিখ্যাত সুরকার, গীতিকার , শিল্পী শচীন দেব বর্মণের বংশধর আজ ভারতীয় টেনিসের রক্ষাকবচ। লিয়েন্ডার পেজের পর সার্কিট ও ডেভিসকাপের সিঙ্গেল্‌সে ভারতীয় টেনিস পতাকা বহনের বৃষস্কন্ধের অধিকারী এই ত্রিপুরাতনয়। তার প্রমাণও মিলেছে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। চেন্নাই এ টি পি ওপেনে পরপর দু'জন বিশ্ব তারকাকে পর্যদুস্ত করে যেভাবে ফাইনালে উঠেছিলেন, তা দেখে বিজয় অমৃতরাজের মতো উন্নাসিক যোদ্ধা পর্যন্ত তার বিস্ময় চেপে রাখতে পারেননি।

তবে এখনই মাত্রাতিরিক্ত আবেগ ও প্রশংসায় ভরিয়ে দেবার সময় আসেনি। সোমদেবকে এখন মিডিয়ার আতিশয্য, বিজ্ঞাপন জগতের মোহময় হাতছানি উপেক্ষা করে, একলব্যের মতো টেনিস নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। তার উচ্চশিক্ষিত বড় চাকুরে পিতা জীবনের সমস্ত কানাকড়ি খরচ করে তাকে প্রথমে চেন্নাইয়ে অমৃতরাজ টেনিস অ্যাকাদেমি পরে আমেরিকায় 'টেনিস স্কুলিং করিয়েছেন। সেদেশে কলেজ পর্যায়ের টেনিস যথেষ্ট জনপ্রিয় ও উঁচুমানেরও বটে। সেই পর্যায়ের টেনিসে চাম্পিয়ন হয়ে নিজের জাত চিনিয়ে তবেই পেশাদার সার্কিটে পা রেখেছেন। ভিতটা মজবুতভাবে গড়ে উঠেছে বলেই এ টি পি সার্কিটে অনেকদিন টিকবেন সোমদেব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে কলেজিয়েট টেনিস থেকে উঠে আসা ছেলে-মেয়েরাই পরবর্তী কালে বিশ্ব টেনিসে দাপিয়ে রাজ করেছেন। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। সোমদেব যে ব্যতিক্রমের দলে পড়বেন না, তা তার আত্মপ্রত্যয় ও উচ্চাশা দেখেই বোঝা গেছে। কয়েকমাস আগে রুমানিয়ার বিরুদ্ধে ডেভিসকাপ প্লে-অফ টাইয়ে ভারত অধিনায়ক লিয়েন্ডার দলের একাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাকে খেলিয়ে ছিলেন দুটো সিঙ্গেলেই। লিয়েন্ডারের অভিজ্ঞ চোখ বুঝেছিল সোমদেবই তাঁর উত্তরসূরী হয়ে উঠতে পারে। প্রকাশ অমৃতরাজ, রোহন বোপান্নারা অনেক সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। সোমদেব অবশ্য সেই টাইয়ে দুটো সিঙ্গেলসেই হেরে গিয়েছিলেন, নেহাতই অনভিজ্ঞতার কারণে।

গোটা দেশের মিডিয়াকূলের সমালোচনা, মহেশ ভূপতির নেতৃত্বে প্রকাশ, বোপান্নার বিদ্রোহ আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে গুরু-শিষ্য লিয়েন্ডার সোমদেবকে। সেই ডেভিসকাপ থেকে যে যথেষ্ট শিক্ষা নিয়েছিলেন সোমদেব, তা টের পেলেন তার সমালোচকরা — চেন্নাই ওপেনে। গড়পড়তা ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়ের সঙ্গে তার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র শারীরিক গঠন ছাড়া। মাঝারি হাইটের দোহারা-চেহারার ছেলেটির চোখে মুখে আগুন ঠিকরে বেরোয়। শেষ পয়েন্ট পর্যন্ত লড়ে যাবার স্ট্যামিনার ও জেতার জন্য যেকোনও মূল্যে জীবনকে বাজি রাখা, এই ব্যাপারগুলো লিয়েন্ডারের মধ্যে ছিল বলেই না সোমদেবকে এত ভালোবাসেন মাইকেল মধুসূদনের বংশধর। তাই তো কার্লোস মোয়ার মতো প্রাক্তন বিশ্বসেরা তার হাতে বধ হবার পর বলেন, সোমদেব এক ব্যতিক্রমী ভারতীয় চরিত্র।

বিজয় অমৃতরাজ, রমেশ কৃষ্ণণের অবসরের পর লিয়েন্ডার পেজ এসে পড়ায় সেভাবে শূন্যতা অনুভব করেনি ভারতীয় টেনিস। আবার লিয়েন্ডারের সঙ্গে টপ ফর্মে চলে আসেন মহেশ ভূপতি। দু'জনে মিলে এ টি পি সার্কিট, ডেভিস কাপ দু'ক্ষেত্রেই ভারতীয় টেনিসের অবস্থান ও গৌরব গাঁথাকে সুসংহত রূপ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের পরে কে? এই চিন্তা, আশঙ্কাটা দানা বাঁধছিল অনেক দিন ধরেই, বহু খেলোয়াড়কে পরীক্ষা করা হয়েছে ডেভিসকাপে। কেউই তাদের ওপর অর্পিত আস্থার প্রতিফলন ঘটাতে পারেননি। সাম্প্রতিক প্রকাশ, বোপান্নারাও লি হেসকে অবসরের কথা চিন্তা করার অবকাশ দিচ্ছেন না। তাঁদের ব্যর্থতা মধ্য তিরিশেও লি-হেসকে কোর্টে নামতে বাধ্য করছে। সোমদেবের উত্থান, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করছেন দু'জনেই। হয়তো এবছর কিংবা আগামী বছরেই টেনিস র‍্যাকেট তুলে রাখবেন বহু কীর্তির অধিকারী এই দুই ভারতীয়। আর তাদের উত্তরাধিকার পথে নিয়ে যাবেন এক বঙ্গ সন্তান, বাঙালিদের কাছে যে ব্যাপারটা পরম আনন্দের।

অলিম্পিক পদকেও জুটল না 'পদ্মশ্রী'

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ খেতাবগুলো বোধহয় বিশ্ব অলিম্পিক পদকের চেয়েও মহার্ঘ। ভারত সরকারের চিন্তা-ভাবনা দেখে সে কথাই মনে হয়। ভারত যে কেন অলিম্পিক রাষ্ট্র হয়ে ওঠে না তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত এই ঘটনা। প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারত সরকার পদ্মশ্রী দিলেন অক্ষয় কুমার, ঐশ্বর্যা রাই মায় হেলেনকেও, অথচ বিজেন্দার কুমার, সুশীল কুমারের কথা তাদের মাথায় এল না। হিন্দী সিনেমা যে দেশকে অনেক গৌরব এনে দিয়েছে, দেশের মানুষকে শিক্ষা-সংস্কৃতি-সংস্কার দিচ্ছে। খেলা এসব কিছুই করে না!

এই কারণেই বোঝা যায় ভারত কেন সারা জীবন উন্নয়ণশীল রাষ্ট্রের তকমা বহন করে চলবে, আর যার বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণে সব পরিকল্পনা রূপায়ণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অন্য দিকে প্রতিবেশী চীন বিশ্বের বিস্ময় হয়ে ওঠে একই সময়ে স্বাধীনতা পেয়ে। পাশ্চাত্য দুনিয়ার কথা বাদ দিন, এশিয়ার অনেক দেশই আজ সামাজিক পরিকাঠামো, অর্থনীতি, শক্তিশালী রাষ্ট্রনীতি ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রেই ভারতের থেকে কয়েক যোজনা এগিয়ে। তার কারণ ভারতের সঙ্গে এসব দেশের নেতৃবৃন্দের মানসিকতার তফাৎ।

অলিম্পিক যে একটা দেশের, একটা জাতির সমাজ গঠনের চালিকা শক্তি, এই বোধ যেদিন সরকার, মিডিয়া, জনসাধারণ বুঝবে সেদিন থেকে এই দেশের প্রকৃত উন্নতি শুরু হবে। এ ব্যাপারটা স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ খৃস্টাব্দে প্যারিস অলিম্পিকে গিয়ে বুঝেছিলেন। তাই তাঁর কণ্ঠে ও কলমে ধ্বনিত হয়েছে বেদান্তের সঙ্গে অলিম্পিক আন্দোলনের সমন্বয়বোধ। সমগ্র মানবজাতি ও সভ্যতার দিকদর্শিকা এই দুই আদর্শের মেলবন্ধন। আর সেই অলিম্পিক থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ত্যাগ তিতিক্ষার কৃচ্ছ্রসাধনে মহামূল্যবান ব্রোঞ্জপদক এনেও বিজেন্দার, সুশীল কুমারদের কপালে জুটল রাষ্ট্রীয় উপেক্ষা।

প্রতিবছর একাধিক ক্রিকেটার, বাণিজ্যিক ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রী পেয়ে যান পদ্মশ্রী। অথচ জীবনধর্মী, সমাজবাস্তব ছবি নির্মাতা, গ্রুপ থিয়েটার কুশীলব, সংস্কারধর্মী কবি, লেখক যারা সব অর্থেই সরস্বতীর সাধনা করে চলেছেন, মানুষকে নৈতিকতা, মূল্যবোধের আদর্শে জাগরিত করছেন তাদের কথা মাথায় আসে না সরকারি মন্ত্রী, আমলাদের।

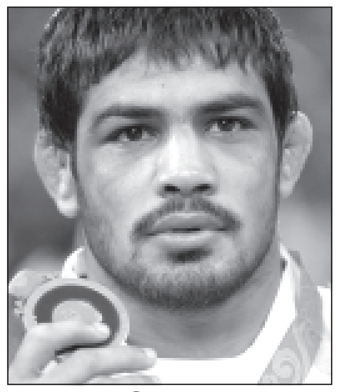

সুশীল কুমার

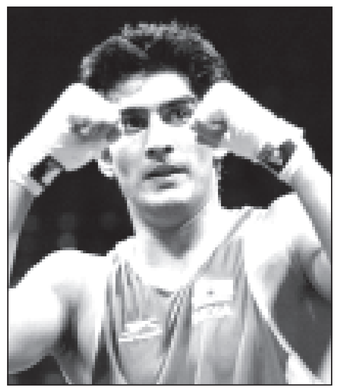

বিজেন্দার কুমার

এই ব্যাপারটা নিয়ে মিডিয়াও সেভাবে সরব হয় না। তাই অলিম্পিক, এশিয়াড, কমনওয়েলথ গেমস থেকে পদক নিয়ে এসেও যে স্বীকৃতি পাওয়া যাবে না, এই সার সত্যটা ধরে বুঝেই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে বিজেন্দারদের। তারা একতরফাভাবে দেশকে কিছু দিয়ে যাক, প্রতিদানে কিছু না পেলেও চলবে।

ত্রিপুরায় সঙ্ঘের জাতীয় চেতনা জাগৃতি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। হিন্দুরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শৌর্যে-বীর্যে, ধনে-সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও সুপ্রাচীনকাল থেকে বারবার বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। হিন্দুদের চেতনা ও সংগঠনের অভাবই এর কারণ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাই হিন্দুসমাজকে সংগঠিত করে ভারতবর্ষকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে চায়। গত ২৬ জানুয়ারি আগরতলায় সঙ্ঘের ত্রিপুরা সম্ভাগের কার্যকর্তা শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের প্রাক্তন প্রান্ত সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, মুসলিমরা বিশ্বকে দারুল ইসলাম ও দারুল-হারব, খৃস্টানরা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী এবং কম্যুনিস্টরা প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া হিসাবে ভাগ করেছে। একমাত্র হিন্দুরাই বিশ্বের মানুষকে কখনও ভাগ করেনি। হিন্দুরা বিশ্বের মানুষকে 'অমৃতস্য পুত্রা' বলে মনে করে। আশার কথা হল, ভারতের চারদিকেই হিন্দু জাগরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি অমরনাথ জমি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে জম্মুর আন্দোলন, রামসেতু রক্ষায় হিন্দুদের দাবি সুপ্রীম কোর্টের মেনে নেওয়া, গুজরাটের গোধরায় করসেবকদের এবং ওড়িশায় স্কন্দমালে স্বামী লক্ষ্মণানন্দের নৃশংস হত্যার বদলায় প্রচণ্ড ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের কথা উল্লেখ করেন।

সমারোপ অনুষ্ঠানে স্বয়ংসেবকেরা দণ্ডযোগ প্রদর্শন করছেন। বক্তব্য রাখছেন রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ২৪ থেকে ২৬ জানুয়ারি তিনদিনের এই শিবিরে ত্রিপুরার সব জেলা থেকে ২৫০ জন সঙ্ঘের স্থানীয় কার্যকর্তা যোগ দেয় এবং শিবিরের নির্দিষ্ট কার্যক্রম তথা পথ সঞ্চলনে অংশ নেয়। সমারোপ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী স্বয়ংসেবকরা যোগব্যায়াম, আসন ও সূর্যনমস্কার প্রদর্শন করে। বেশ কয়েকবছর পর ত্রিপুরায় এ ধরনের কার্যকর্তা শিবির অনুষ্ঠিত হল। উল্লেখ্য, এই শিবিরকে জাতীয় চেতনা জাগৃতি সম্মেলন বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

সমারোপ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডঃ প্রভাস চন্দ্র ধর। ত্রিপুরা সম্ভাগ কার্যবাহ নৃপেন রায় সকলকে ধন্যবাদ জানান।

শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রীয় প্রচারক কৃষ্ণ গোপাল শর্মা, কেন্দ্রীয় কার্যবাহ মানিক চন্দ্র দাস, সহ ক্ষেত্রীয় প্রচারক গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী, দক্ষিণ অসমের প্রান্ত প্রচারক বলরাম দাস রায়, সম্ভাগ প্রচারক মহেন্দ্র সিং, সাপ্তাহিক স্বস্তিকার সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য প্রমুখ সঙ্ঘের কার্যকর্তারা।

হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

(৩ পাতার পর)

এছাড়া ভারত যে তার সনাতনী বৈদিক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে হারাচ্ছে তার অন্যতম কারণ হল ইংরেজী খৃস্টান শিক্ষা ব্যবস্থা। অবশ্য সরকারি স্কুলগুলির সিলেবাস থেকেও বৈদিক গ্রন্থাদির বিষয়গুলি লুপ্ত হচ্ছে। সুতরাং স্কুলগুলি থেকে প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও মূল্যবোধের শিক্ষা অবলুপ্তির পথে। সুতরাং বৈদিক শিক্ষা (মূল্যবোধ শিক্ষা) ছেলে-মেয়েরা আর শিখছে না। আবার খৃস্টান স্কুলগুলিতে খৃস্টান মিশনারীরা শিক্ষকের কাজ করছেন এবং প্রতিদিন এঁরা বাইবেল পড়বেন অথবা মুসলিম স্কুলগুলিতে কোরান। দেশের তথাকথিত সেক্যুলার সরকার এদের বিনামূল্যে জমি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। যেহেতু ইংরেজীসহ অন্যান্য অনেক ভাল বিষয় এসব স্কুলে পড়ানো হচ্ছে, তাই মধ্যবিত্ত অভিভাবকেরা এইসব স্কুলগুলিতে ভীড় জমাচ্ছেন। বর্তমানে দেশের অনেক অভিভাবকেরা এইসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, তাই এরাও তাদের ছেলে-মেয়েদেরও এইসব স্কুলে পাঠাচ্ছে। যদি এমন ধারা চলতে থাকে তবে শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুভাবধারার সংখ্যা কমবে। এইভাবে ভারতীয় শিশুরা সেক্যুলার সরকারের বদান্যতায় খৃস্টান মূল্যবোধে দীক্ষিত হচ্ছে এবং এদের কাছে ভারতীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতির প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। এরা শিখছে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা এসব হল পৌরাণিক গল্প এবং তাদের শেখানো হচ্ছে না যে পৃথিবীর সভ্যতার পরাকাষ্ঠা এইসব পুস্তকগুলি। পরিবর্তে শেখানো হচ্ছে যে, হিন্দু দেব-দেবী রাক্ষস-রাক্ষসী এবং প্রকৃত ভগবানের উপাসনা করা যাবে কেবলমাত্র যীশুর মাহাত্ম্য প্রচারে।

যেমন নয়াদিল্লীর ইস্কনের কিছু ভক্ত বিভিন্ন স্কুলে ক্লাস নিয়েছেন বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের। তাঁদের কাছে শিশুদের প্রশ্ন, "তোমাদের ঈশ্বর কে? তিনি আমাদের জন্য কী করতে পারেন?" এবং আরও কত কী? স্বভাবতই এমন সব প্রশ্ন দেশের ইংরেজী শিক্ষার কু-পরিণাম যা বর্তমান শিশুরা পেয়ে আসছে। আমার প্রশ্ন হল, এসব কি ধর্মান্তরকরণের এক প্রচ্ছন্ন শিক্ষা নয়? এইভাবে বর্তমান শিশুদের তাদের স্বীয় ধর্ম, সংস্কার, পরম্পরার বিষয়ে মনে একটা অনাস্থার শিকড় গেঁথে দিচ্ছে, এইসব বিষয়কে অপমান করতে শেখাচ্ছে। পরিণামে এই শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু শিশুরা তাদের প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি ভুলতে বসেছে। ভারত পরিভ্রমণকালে সারা দেশে প্রাথমিক স্কুলগুলির অধিকাংশের নাম "সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল" দেখেছি। মানুষের জানা উচিত ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স লোকটা কে? তথাকথিত এই সন্ত যিনি এত বিখ্যাত তিনি কী বলেছেন জানেন? তিনি বলতেন, "যখন আমি সমস্ত মানুষকে ধর্মান্তরিত করব, তখন এদের বলব তোমরা তোমাদের ঘর ভেঙ্গে ফেল যেখানে তোমরা পুতুলরূপী ঈশ্বর রেখেছ। আমি তাদের দিয়ে জোর করে তাদের পুতুল ঈশ্বরকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলবো, কারণ তারা খৃস্টান। আমি পরিতৃপ্ত হব সেদিন যেদিন পুতুল পুজারীরা নিজের হাতে তাদের উপাস্য দেবতাদের ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।" এইভাবেই ভারতবর্ষকে খৃস্টান রাষ্ট্র হিসেবে তৈরি করার চক্রান্ত চলছে। পরিতাপের বিষয় হল এরকম একজনকে ভারতীয়রা সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করছে। এই সন্তের মুখ্য উদ্দেশ্য কি অজানা? স্বীকার করা হয় না যে, গত ৫০ বছর ধরে যারা দেশটা চালাচ্ছে তারা হিন্দু বিদ্বেষী। তারা যে আর্থিক নীতি, শিক্ষানীতি রচনা করছে তাকেই জোর করে মানতে হচ্ছে। তারা যেন আদা জল খেয়ে নেমেছে সংখ্যালঘু স্বার্থ রক্ষা করতে কেবলমাত্র ভোটের লালসায়।

> "কোনও ধর্মই হিন্দুত্বের মতো এত বৈজ্ঞানিক, এত দার্শনিক এবং এত আধ্যাত্মিক নয়। যতই একে জানবেন, ততই একে ভালবাসবেন, যতই এই ধর্মকে বুঝবেন ততই এর মূল্যায়ন আপনি করতে পারবেন। হিন্দুত্ব ব্যতীত ভারতের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। হিন্দুত্ব হচ্ছে ভূমি যার মধ্যে ভারতের মূল প্রোথিত।"

বৈদিক সংস্কৃতির অবমূল্যায়নের আরেকটা অন্যতম কারণ হল ১৫-২৫ বছরের তরুণ-তরুণীরা বৈদিক জীবনধারা বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরছে কেবলমাত্র স্বাধীনতার লালসায়। তারা পশ্চিমী সিনেমা দেখছে, কাগজে পশ্চিমী দুনিয়ায় কী চলছে তা পড়ছে, তাদের পোশাক, তাদের জীবনধারায় আকৃষ্ট হচ্ছে। এইভাবে মুম্বাইয়ের মতো বড় শহরে নারী-পুরুষ বিয়ে না করে সহবাস করছে, যা অতীতে দেখা যায়নি। বর্তমান বৈদিক সংস্কারকে ব্রাত্য হিসেবে দেখা হচ্ছে, অথচ এই সংস্কার মানুষকে ব্যভিচারী হতে দেয় না — অথচ এমন সংস্কার পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে। সংস্কৃত পণ্ডিতদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে মন্দিরগুলোতে এবং আধুনিক ভারতীয়রা বলছে রামায়ণ-মহাভারত হল কল্প-কাহিনী যা টিভিতে দেখে আনন্দ পাওয়া যায়।

বহিরাগতেরা বারবার ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে এবং সেই আক্রমণ প্রমাণ করেছে — এ ব্যাপারে আমি বলতে চাইছি যে, এই আক্রমণ হয়েছিল মাত্র সম্পদ লুণ্ঠন ও ভৌগোলিক সীমানা দখলের সীমারেখার মধ্যে। কিন্তু বর্তমানে চলছে সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ। যেহেতু বর্তমান তরুণ প্রজন্ম যেভাবে বৈদিক সংস্কৃতি পরিত্যাগ করছে, যদিও পরে বৃদ্ধ বয়সে ভুল বুঝে মূল স্রোতে ফিরে এলেও যা ক্ষতি হবার তা হয়েই যায়।

সমস্যার দিকে আমরা একটু দৃষ্টিপাত করি। বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ-ই হিন্দু — এমনটা শুনতে ভাল লাগলেও এর মধ্যে ১৫ শতাংশ বৌদ্ধ, শিখ আর জৈন। প্রকৃত অর্থে হিন্দুরা ৭০ শতাংশ। আরও কয়েক প্রজন্ম পরে আমরা দেখব হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে। যেভাবে ধর্মান্তকরণ অবাধে চলছে তাতে মাত্র কয়েকটা প্রজন্মেই হিন্দুর সংখ্যা ৫০ শতাংশের নীচে নেমে যাবে।

আর কয়েকটি প্রজন্ম পরে হিন্দুরা তার নিজের দেশেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে? হিন্দুর সংখ্যা যেহেতু কমছে, আপনারা দেখবেন অচিরেই যে সরকার ভবিষ্যতে তৈরি হবে তা হবে বর্তমান সংখ্যালঘুদের অনুকূলে এবং তাদেরই অনুকূলে তৈরি হবে আইন-কানুন। এইভাবে চলতে থাকলে দেখা যাবে হিন্দুরা বা বৈদিক সংস্কৃতির মানুষেরা গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং তাদের আবাসস্থল হবে মন্দিরের আশেপাশে। এইসব তথ্যের যোগানের অর্থই হল হিন্দু এবং তাদের সমর্থকেরা বা বৈদিক সংস্কৃতির ধারক বাহকেরা, সনাতন ধর্মের অনুগামীরা বুঝতে শিখুন কী ঘটছে এবং তারা নির্ভীকভাবে এগিয়ে এসে প্রতিহত করুক যতক্ষণ স্বাধীনতা থাকে। এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে, রক্ষা করতে আরও সক্রিয় হতে হবে। বিষয় হল এই যে, এখনই সচেতন না হলে আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে, এই নিষ্ক্রিয়তা ও সহনশীলতার সাহায্যে অন্যরা একদিন নিজেদের লক্ষ্যভেদ করবে এবং ভারতের ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলবে। এর কারণ একদিন এই সক্রিয় বৈদিক সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটবে। আমাদের প্রয়োজন হল স্থিতাবস্থা বজায় রেখে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হতে হবে। এইজন্য আমরা সংগঠিত হব এবং সংগঠিতভাবে এ কাজ করতে হবে এবং সচেষ্ট হলে এই আক্রমণ প্রতিহত করাও সম্ভব। এই তো কিছুদিন আগে অধ্যাপক সুভাষ কাক আমায় বললেন যে, এক বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা প্রকাশ করেছে যে, রাশিয়া ১ শতাংশ মানুষ নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করেছে। এই লেখায় আরও বলা হয়েছে যে, এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানতঃ ইস্কনের প্রচারের ফলে। এর সামাজিক প্রভাব অপরিসীম। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, সুসংহতভাবে কাজ করলে এসবই সম্ভব। সেইজন্য আমার বিশ্বাস, বৈদিক পরিবারের ছাতার তলায় আমরা কাজ করতে পারি তবে আমরা বর্তমান স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করে বৈদিক সনাতন ঐতিহ্যের প্রচার আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। তবেই ভারত হয়ে উঠবে বৈদিক ঐতিহ্যের নিজস্ব দেশ এবং আমরা মানবিকতার মূলসূত্র হিসেবে ভারতকে জগৎমাঝে প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

ভারতকে অবশ্যই বৈদিক পরম্পরা, সনাতন ধর্মের পীঠস্থানরূপে হিন্দুত্বকে অনির্বাণ ভাবে জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

ভারতের এবং হিন্দুত্বের মূল্যের বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত ধর্মবিশারদ ডঃ অ্যানি বেসান্ত। তিনি জোর দিয়েছেন ভারতের মূল্যবোধের ওপর, বৈদিক সংস্কৃতি এবং এর গুরুত্ব বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করার উপর। জি এম জগতিয়ানি তার **Hindus, Life-line of India** পুস্তকের প্রস্তাবনায় লিখেছেন, "গত চল্লিশ বছরে নিবিড় অধ্যয়নের পর আমি দেখেছি কোনও ধর্মই হিন্দুত্বের মতো এত বৈজ্ঞানিক, এত দার্শনিক এবং এত আধ্যাত্মিক নয়। যতই একে জানবেন, ততই একে ভালবাসবেন, যতই এই ধর্মকে বুঝবেন ততই এর মূল্যায়ন আপনি করতে পারবেন। হিন্দুত্ব ব্যতীত ভারতের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। হিন্দুত্ব হচ্ছে ভূমি যার মধ্যে ভারতের মূল প্রোথিত। বহু ধর্ম, বহু জাতি এই দেশে বিস্তার লাভ করেছে বটে, কেউই কিন্তু এর অতীতকে মুছে ফেলতে পারেনি, কিংবা এরা কেউই জাতি গঠনে অপরিহার্য নয়। অনেকেরই মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু ভারত জীবিত আছে এবং থাকবে। হিন্দুত্ব মুছে গেলে দেশের অস্তিত্ব কি বেঁচে থাকবে? এবং যদি হিন্দুরা হিন্দুত্বের রক্ষক না হয় তাহলে একে রক্ষা করবে কে? যদি ভারতের নিজস্ব সন্তান তার বিশ্বাসে আস্থা না রাখে তবে একে বাঁচাবে কে? ভারত-ই ভারতকে রক্ষা করতে পারে এবং ভারত ও হিন্দুত্ব সমার্থক"।

এই প্রেক্ষিতে এটা খুব জরুরী যে বিভিন্ন ইস্যুতে যদি আমাদের মতান্তর, মনান্তর থাকেও তবে তা সনাতন ধর্ম, বৈদিক সংস্কৃতির রক্ষার্থে আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলতে হবে। বৈদিক স্বার্থ রক্ষার্থে সুসংহত শক্তি গড়ে তুলতে অপরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। অন্যথা সমস্ত রকম বিষয় আমাদের সামনে আসবে এবং যা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, এবং আমাদের সংস্কৃতির প্রচার থেমে না যায় তা দেখতে হবে। এই প্রচারের অর্থ হল বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত হয়। এর উপযোগিতা বোঝাব অন্যকে এবং তাদের প্রতিহত করব যারা এর বিনাশ চায়।

আমরা বিরত থাকব অনর্থক সমালোচনা থেকে যা আমাদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়। আমরা অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা নেব বৈদিক সংস্কৃতিকে রক্ষা করায় এবং তৎসহ এর প্রচার ও প্রসার করার কাজে। তখনই আমরা আমাদের প্রাপ্য স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে একসঙ্গে কাজ করে বৈদিক সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ভারতকে এক মাতৃভূমি রূপে প্রতিষ্ঠা করে এই সনাতনী সজীব পরম্পরাকে এগিয়ে নিতে যেতে সাহায্য করব। এই স্বাধীনতা সহজলভ্য নয়, অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয় এবং এই বাধাকে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে সমাজকে।

Swastika
9 February - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

চার শহীদ স্বয়ংসেবকের স্মৃতিতে

ত্রিপুরায় সেবাধাম প্রকল্প-ফলকের উন্মোচন

চার শহীদ স্বয়ংসেবকের প্রতিকৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ২৬ জানুয়ারির সকালে আগরতলা থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার দূরে পাহাড়-বনাঞ্চলে ঘেরা এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশে সেবাধাম প্রকল্পের স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন দক্ষিণবঙ্গ সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দশ বিঘা জমির উপর নির্মীয়মান এই প্রকল্পটি ত্রিপুরায় উগ্রপন্থীদের দ্বারা অপহৃত ও নিহত সঙ্ঘের কাজে নিবেদিত প্রাণ চারজন স্বয়ংসেবক — শ্যামল কুমার সেনগুপ্ত, দীনেন দে, শুভঙ্কর চক্রবর্তী এবং সুধাময় দত্ত-এর স্মরণে উৎসর্গ করা হয়েছে। এ দিনের অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানান ত্রিপুরার ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির সম্পাদক হারাধন পাল। সমিতির অন্যতম সদস্য পীযূষ ভট্টাচার্য মঙ্গলাচরণ করেন। এরপর শহীদ চারজন স্বয়ংসেবকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত চারজন শহীদ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই প্রকল্পের কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। সমিতির সভাপতি ধীরেন্দ্র কলুই সকলকে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য, আগামী শিবরাত্রির দিন নির্মীয়মান শিবমন্দিরে ভগবান শিব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎসব হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নানা ধরনের সেবাকাজ পরিচালিত হবে বলে সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ফলকের উন্মোচন করছেন রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্রদুর্গ — যেন স্বপনপুরীর রাজকন্যা

দুর্গাপদ ঘোষ ।। কয়েকটি গুপ্ত প্রবেশ পথের সাক্ষী ওবাভ্ভার স্বামী। অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ। প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, কথা দিয়েছেন প্রাণ গেলেও দুর্গ রক্ষা করবেন তিনি। 'প্রাণ যায় পর বচন না যায়' — প্রকৃতির মানুষ। দুর্গের মধ্যে সপরিবারে তাঁর থাকার ব্যবস্থা। দিন দুপুরে গুপ্তঘাতক কিম্বা অনুপ্রবেশকারীর ঢোকার সম্ভাবনা কম। তাই রোজ দুপুরে খেতে আসেন বাড়িতে। একদিন স্বামীকে খেতে দিতে গিয়ে ওবাভ্ভা দেখলেন খাবার জল ফুরিয়ে গেছে। তিনি গেলেন জল আনতে।

কিন্তু সেই যে গেছেন আসার আর নাম নেই। খেতে বসা স্বামী প্রথমে বিরক্ত, তারপর চিন্তিত, শেষে আতঙ্কিত। কী এমন ঘটল, ওবাভ্ভা ফিরে আসছে না। এমন তো কখনও হয় না! আসলে জল নিয়ে ফেরার পথে দুর্গের এক গুপ্তপথের কাছে ওবাভ্ভা শুনতে পেলেন কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। সন্ত্রীর স্ত্রী তিনি। তাঁর তৃতীয় ইন্দ্রিয় মুহূর্তেই বুঝতে পারল বাইরের কেউ দুর্গের গুপ্তপথ দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করছে। কর্তব্যপরায়ণ বীর স্বামীর যোগ্য পত্নী তিনি। তাছাড়া নিষ্ঠাবতী স্বামীপরায়ণা। চিৎকার করে স্বামীকে ডাকলে একে তো অনুপ্রবেশকারীরা পালিয়ে যাবে, দ্বিতীয়ত অর্ধভুক্ত অবস্থায় উঠে আসবেন স্বামী। থাকবেন ক্ষুধার্ত, অভুক্ত। সুতরাং যা করার তা তাঁকেই করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিলেন ওবাভ্ভা।

প্রবেশ পথটি খুবই সংকীর্ণ। কোনও মতে একজন ঢুকতে পারে। নিঃশব্দে, দ্রুতপায়ে ঘরে ফিরে স্বামীকে কিছু না বলে, একখানা মোটা লাঠি নিয়ে যেমন দ্রুতপদে এসেছিলেন তেমনি আবার চলে গেলেন। বীর স্বামীর বীরাঙ্গনা পত্নী। লাঠি বাগিয়ে অপেক্ষায় রইলেন দুরাচারীর দুর্গে প্রবেশের অপেক্ষায়। যেই একজন ভিতরে মাথা গলাল, সজোরে তার মাথায় আঘাত করলেন ওবাভ্ভা। টেনে নামিয়ে নিলেন ভিতরে। বাকীরা কিছু জানতেই পারল না।

তাদের একজন ভিতরে ঢুকেছে আন্দাজ করে ঢুকল আর একজন। তারপর আরও একজন। এইভাবে নয় নয় করেও সাতজন। সকলেরই ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন ওভাভ্ভা। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে স্ত্রীকে ফিরতে না দেখে তাঁর স্বামী আর স্থির থাকতে পারলেন না। ততক্ষণে তাঁর ভোজনও সাঙ্গ হয়ে গেছে। এবার তিনি বেরুলেন স্ত্রীর খোঁজে। গুপ্ত দরজার কাছে এসে বীর পত্নীর সাহসিকতা দেখে তো যারপরনাই অবাক। যে কাজ তাঁর করার কথা, তা পালন করেছেন ওবাভ্ভা।

স্বদেশপ্রেম এবং বীরত্ব-এর সম্মিলিত এই কাহিনী আজও কিংবদন্তী হয়ে আছে কেবল চিত্রদুর্গেই নয়, কর্ণাটকের ঘরে ঘরে। মা-ঠাকুমা'র কাছে শিশুরা আজও শোনাতে গেলে। যেন শ্লোক বলা কাজলা দিদির কাছে বলার মতো একটা চিরন্তনী কথা হয়ে রয়েছে ওবাভ্ভার এই বীরত্বগাথা।

বহুদিন হয়ে গেল ওবাভ্ভা নেই, নেই তাঁর সেই সাস্ত্রী স্বামীও। কিন্তু স্বমহিমায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেই দুর্গ — চিত্রদুর্গ। ৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বেঙ্গালুরু যাবার পথে একটুখানি ভিতরে ঢুকলেই মনে হবে যেন ভঙ্গিল পর্বতের একটি খণ্ডাংশ। কিন্তু বিশ্ববিশ্রুত হেরিটেজ সাইট হাম্পি দর্শনার্থীদের অনেকেরই অবশ্য দর্শনীয় এই দুর্গটির কথা জানা নেই। থাকলেও অনেকে সময় খরচ করে যান না। চিত্রদুর্গ তাই সর্বসাধারণ্যে আজও যেন একখানা পটচিত্র হয়েই থেকে গেছে।

দেভানগেরের খুব কাছেই, ব্যাঙ্গালোর থেকে ২০০ কিলোমিটার মতো দূরে। চিত্রদুর্গ শহরটি এখন একটি জেলা সদরও বটে। কিন্তু চারিদিকে ৩০ ফুট উঁচু দেওয়াল ঘেরা দুর্গ নগরীটি আজও যেন একটা অন্যতম বিস্ময়। দেওয়াল বা পাঁচিলটি কেবল পাথরের বোল্ডার বা পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি তাই নয়, অনেক চাঁইয়ের গায়ে নিখুঁতভাবে খোদিত হয়েছে দেবদেবীর মূর্তি। প্রচণ্ড দাবদাহেও দেওয়ালটির গা ঘেঁষে যাতায়াত করলে কেমন যেন একটা মনোরম শীতলতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। দুর্গের অভ্যন্তরে পাঁচিলের গা ঘেঁষে রয়েছে বেশ কয়েকটা পাথরের আসন। পাহারাদাররা মাঝে মাঝে সেখানে বসে বিশ্রাম নিতেন। দুর্গের মধ্যে এখানে ওখানে যাতায়াতের জন্য রয়েছে বিশাল বিশাল পাথুরে দরজা। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, হাতী দিয়ে দরজাগুলো বয়ে আনানো হয়েছিল।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যটা কেবল স্বপ্নের রাজত্ব ছিল না, পাথরের শিল্পকীর্তির জন্যও এর রাজধানী কিম্বা অন্যান্য নগরী ছিল এককথায় স্বপ্নপুরী। চিত্রদুর্গ যেন সেই স্বপনপুরের এক রাজকন্যা। যার কঠিন দেওয়াল বহিরাক্রমণ থেকে একে অনেকবার রক্ষা করেছে। কিন্তু এর শিল্পসুষমা যেন একে একটি অন্য মাত্রা দিয়েছে। এক আধ মাইল নয়, চিত্রদুর্গের চারিদিকে ৩২ মাইল জুড়ে নির্মিত হয়েছে এই পাথুরে দেওয়াল। নগরে প্রবেশের জন্য প্রধান ফটক রয়েছে ৩৬টি। তাছাড়াও ৩৮টি অলিন্দ দুয়ার। আর ওই গুপ্ত প্রবেশ-নিষ্ক্রমণ পথের সংখ্যা? — ১০২টি। বাস্তুশিল্পের একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন চিত্রদুর্গ।

আধুনিক ইতিহাসের বিচারে চিত্রদুর্গ নির্মিত হয়েছে খৃস্টীয় ২ শতকে। কিন্তু তারও প্রায় তিন হাজার বছর আগে, মহাভারতের কালে কথিত আছে মধ্যম পাণ্ডব ভীম এখানেই নাকি হিড়িম্বার পাণি প্রার্থনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় খৃস্টাব্দে এখানে রাজত্ব করেছেন রাজা সাতবাহন। তাছাড়া কদম্ব, রাষ্ট্রকূট, চালুক্য, হোয়সলা এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দুর্গপ্রাকারের শীর্ষদেশে নির্মিত হয়েছে একনাথেশ্বরী এবং সিদ্ধেশ্বর মন্দির। দুর্গ অভ্যন্তরে রয়েছে আক্কা (বড়বোন বা দিদি) এবং তাঙ্গি (ছোট বোন) নামে দুটি বিশাল বিশাল জলাশয় বা দীঘি। দৃষ্টিনন্দন এই সমস্ত শিল্পকীর্তি মানুষকে তো টানেই। তার সঙ্গে ওবাভ্ভার কিংবদন্তির টান তো আছেই। সব মিলিয়ে চিত্রদুর্গ কেবলমাত্র একটি দুর্গনগরীই নয়, যেন একটি মোহিনী মায়া।

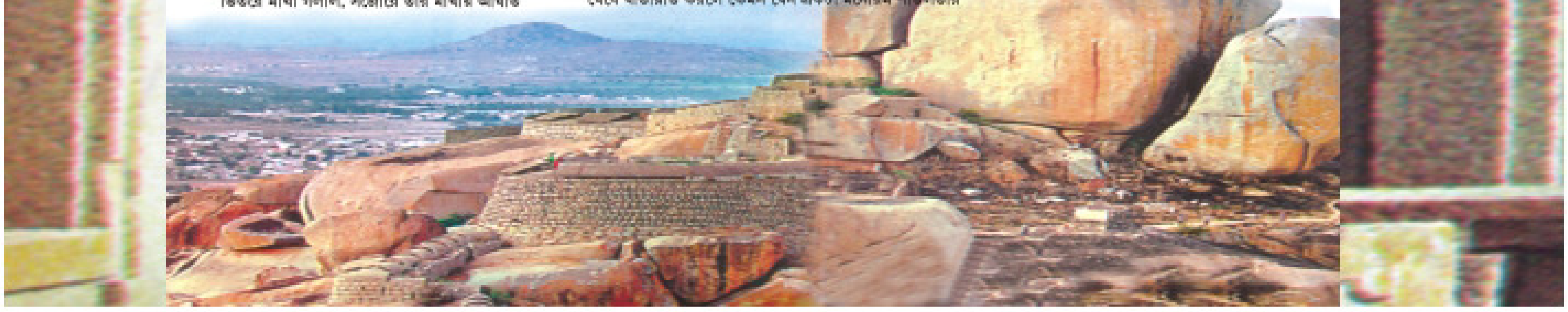

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স : ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com